প্রগতি

প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

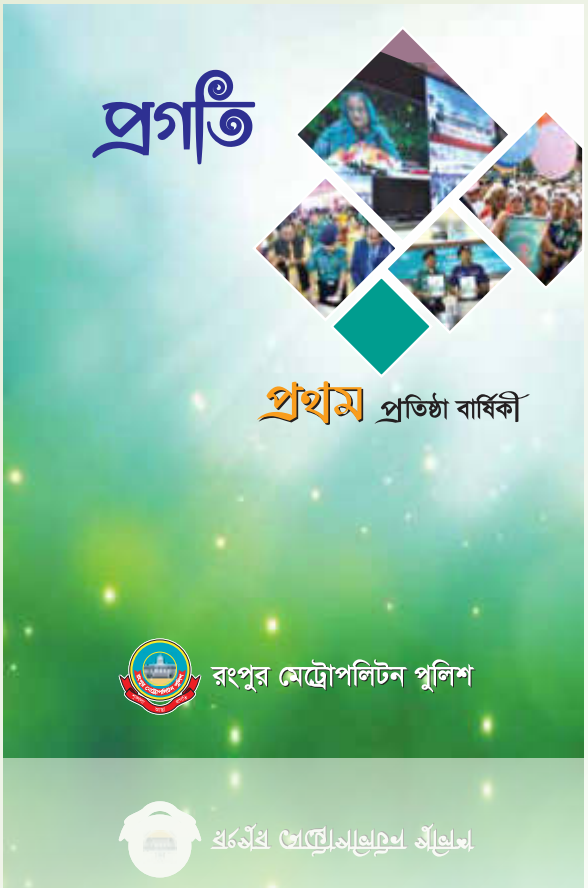

প্রকাশনায় :

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

প্রকাশকাল :

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.

মুদ্রণ :

ইউনাইটেড প্রিন্টার্স
ধাপ, জেল রোড, রংপুর
মোবাইল: ০১৯১৫-৪৫৮০৫৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

- মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম
  পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

উপদেষ্টা :

- মোহাম্মাদ আবু সুফিয়ান
  অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

পৃষ্ঠপোষক :

- মোঃ মহিদুল ইসলাম
  উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

- কাজী মুত্তাকী ইবনু মিনান
  উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

সম্পাদক :

- মোছাঃ শামিমা পারভীন
  অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি)
  (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

সহ-সম্পাদক :

- নাদিয়া জুঁই
  সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্যাট্রোল)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

- মোঃ ফারুক আহমেদ
  সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

সদস্য :

- মোঃ আব্দুর রশিদ
  অফিসার ইনচার্জ (কোতয়ালী থানা)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

- মোঃ আখতারুজ্জামান প্রধান
  অফিসার ইনচার্জ (মাহিগঞ্জ থানা)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

সহযোগিতায় :

- এ কে এম মুহিব্বুল ইসলাম
  সাব-ইন্সপেক্টর, তাজহাট থানা

- মোঃ মজনু মিয়া
  সাব-ইন্সপেক্টর, হারাগাছ থানা

১৬ সেপ্টেম্বর
গৌরবময় সেবার
এক বছর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে বার্ষিক প্যারেড পরিদর্শনে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

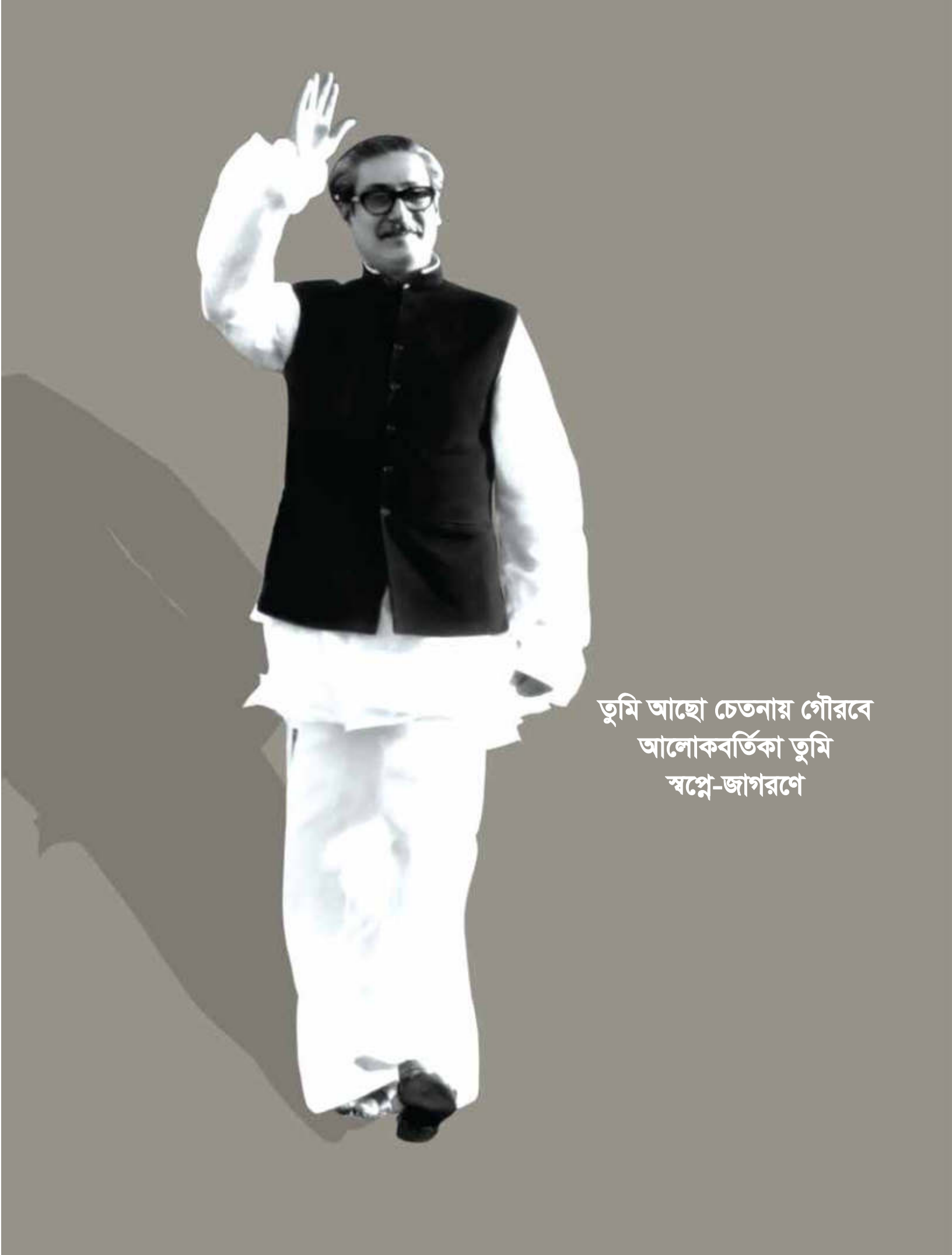

তুমি আছো চেতনায় গৌরবে
আলোকবর্তিকা তুমি
স্বপ্নে-জাগরণে

পুলিশ সপ্তাহ/২০১৯-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

১৬ সেপ্টেম্বর/২০১৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর শুভ উদ্বোধন করছেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
শৃংখলা
আস্থা
প্রগতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

০১ আশ্বিন ১৪২৬
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরপিএমপি) এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ এ বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ পুলিশ সদস্যসহ বিভিন্ন সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মানুষের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখতে পুলিশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য পুলিশকে জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করতে হবে। জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ, অপরাধ দমন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন বিধি মোতাবেক মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশ পুলিশ জনসেবা প্রদান করবে বলে আমি আশা করি।

নবগঠিত ইউনিট হিসেবে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইতোমধ্যে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে জনগণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে পুলিশকে আরো জনবান্ধব করে তুলবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
শৃংখলা
আস্থা
প্রগতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১ আশ্বিন ১৪২৬
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বাণী

রংপুর মহানগরীবাসীর নিরাপত্তা ও অধিকতর সেবা প্রদানের জন্য গঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রথম বর্ষপূর্তিতে এই ইউনিটের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ভয়াল রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী দেশপ্রেমিক বীর পুলিশ সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের নিমিত্তে দেশকে সার্বিকভাবে উন্নত করতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম রংপুরবাসীকে। আমাদের সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছে। আজ রংপুরবাসী বিশেষ করে মহানগরে বসবাসকারী সকল নাগরিক তার সুফল ভোগ করছেন।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশ বাহিনীকে একটি দক্ষ জনবান্ধব ও প্রতিশ্রুতিশীল বাহিনীতে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। আমি আশা করি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে সেবার মানসিকতা নিয়ে নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নগরবাসীর আশা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
শৃংখলা
আস্থা
প্রগতি

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ১ম বর্ষপূর্তিতে আমি নবগঠিত এই ইউনিটের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

১ম বর্ষপূর্তির এই শুভলগ্নে আমি স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জনগণকে সহজে পুলিশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তার ঐকান্তিক প্রয়াস ও সময়োপযোগী দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ নবগঠিত এই ইউনিট যাত্রা শুরু করে। মানুষকে উত্তম পুলিশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নব উদ্যম ও কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি ইউনিট।

শৃঙ্খলা, আস্থা, প্রগতি- এই তিন মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে রংপুর মহানগরীতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাফল্যের সাথে দূর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। উত্তরের এই জনপদের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ রেখে রংপুরকে একটি নিরাপদ, বাস-উপযোগী ও উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ পুলিশের নবগঠিত এই ইউনিটটি ইতোমধ্যে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, ইতিবাচক, জবাবদিহিমূলক ও জনকল্যাণমূখী পুলিশিং প্রবর্তনে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

১ম বর্ষপূর্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান এমপি

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উত্তরের ঐতিহ্যবাহী জনপদ রংপুর মহানগরীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালনকারী রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ১ম বর্ষপূর্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি নবগঠিত এই ইউনিটের সকল সদস্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বর্ষপূর্তির এই স্মরণীয় ক্ষণে আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, যার সুযোগ্য নেতৃত্বে অল্প সময়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর আত্মপ্রকাশ করেছে।

একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শান্তিপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিরাপদ সমাজ। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় বলা হয় Development is Security and Security is development. বর্তমান সরকার এই ধারণার উপর গুরুত্বারোপ করে পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়ন, জনবল বৃদ্ধি ও সেবা প্রদান সহজীকরণে অনেক নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে পুলিশে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন ইউনিট এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সরকার গঠন করেছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর।

শৃঙ্খলা, আস্থা, প্রগতি- এ তিন আদর্শকে লালন করে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রত্যেক সদস্য তাদের চাকুরি জীবনে যথাযথ শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা ও পেশাগত আচরণ মেনে চলার মাধ্যমে অত্র ইউনিটকে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত করেছেন। একইভাবে নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ এবং প্রো-একটিভ পুলিশিং ব্যবস্থার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে রংপুর মহানগরীকে একটি নিরাপদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বান্ধব ও যানজটমুক্ত নগরীতে পরিণত করেছেন।

ফলশ্রুতিতে রংপুর মহানগরের প্রত্যেক বাসিন্দা তথা সকল পেশাজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে তাদের নিজ নিজ কর্মকান্ড করে যাচ্ছেন। দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিশ্চিন্ত ও আশঙ্কামুক্ত হয়ে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে রংপুর মহানগরীতে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ করতে পারবেন। এতে করে এ শহরে গড়ে উঠবে নতুন নতুন কল-কারখানা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। মানুষের টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে। এভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে রংপুরের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সংঘটিত হবে। রংপুর মহানগরীতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুরের এই অগ্রযাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ১ম বর্ষপূর্তিতে অত্র ইউনিটের অব্যাহত সাফল্য ও গৌরবান্বিত ভবিষ্যৎ দেখার প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

টিপু মুনসী এমপি

বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় পার্টি
ও সভাপতি
জাতীয় পার্টি, রংপুর জেলা শাখা

বাণী

মানুষের বন্ধু পুলিশ। নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস-এ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার অবিরাম শুভেচ্ছা।

নতুন ইউনিট হিসেবে আত্মপ্রকাশের শুরু থেকেই রংপুর মহানগরীর জনগণের ভরসার আশ্রয়স্থল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। উন্নয়নের যে ছোঁয়া সারা দেশে লেগেছে রংপুরসহ গোটা উত্তরাঞ্চল সেখান থেকে পিছিয়ে নেই। বগুড়া থেকে রংপুর হয়ে নীলফামারী পর্যন্ত এলএনজি গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে শিল্প বিকাশ ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিপ্লব ঘটবে। টেকসই উন্নয়ন ও বিনিয়োগের জন্য চাই টেকসই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সুশাসন। এক্ষেত্রে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে রংপুরের উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ।

আমি মনে করি নবগঠিত ইউনিট হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও আধুনিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের জনবলসহ অন্যান্য বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন। একই সাথে এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি পেলে জনগণ এর সুফল ভোগ করতে পারবে।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর বর্ষপূর্তিতে আমি অত্র মহানগর পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নিরাপত্তা প্রদানসহ দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের মজবুত ভিত্তি বিনির্মাণে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশ পুলিশকে একটি দক্ষ, জনবান্ধব ও প্রতিশ্রুতিশীল বাহিনীতে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে পুলিশের জনবল বৃদ্ধি, নতুন প্রযুক্তির সংযোজন, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, বিশেষায়িত ও নতুন ইউনিট গঠন, আধুনিক সরঞ্জামাদি ও যানবাহন সংযোজনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন করা হয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক ও জনবান্ধব পুলিশিং এর মাধ্যমে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ বাহিনীর প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা ও ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা বর্তমান সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। আমি আশা করি এ বাহিনীর সকল সদস্য তাদের পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও সততার মাধ্যমে তা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ১ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এ মহানগর পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তফা কামাল উদ্দীন

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের কনিষ্ঠতম ইউনিট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ১ম বর্ষপূর্তির এই আনন্দঘন মূহুর্তে আমি এই ইউনিটের সকল সদস্যকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ পুলিশ একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী। শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতি- এই তিন মূলমন্ত্রকে ভিত্তি করে বাংলাদেশ পুলিশ জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি নিরাপদ, বাসযোগ্য এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ তাদের উপর অর্পিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব যথাযথ কর্তব্যনিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সেবা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিক প্রত্যাশা পূরণ এবং পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ পুলিশের নবগঠিত এই ইউনিট।

নারী ও শিশু নির্যাতন, মাদক, সন্ত্রাস, চোরাচালান, চুরি-ছিনতাই ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নব উদ্যোগ, ধারণা ও পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে এ সকল অপরাধ দমনের ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। এছাড়াও প্রতিষ্ঠার পরপরই দ্রুততম সময়ে নানামুখী উদ্যোগ এবং e-Traffic Prosecution and Fine Payment System প্রবর্তনের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ মহানগরের যানজট পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি সাধন করেছে। এ সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিউনিটি পুলিশিং-এ জনগণকে উৎসাহিত করে অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকর জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তুলতে হবে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নবগঠিত এই ইউনিটের সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)

বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর বিভাগ

বাণী

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অত্র ইউনিটে কর্মরত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ পুলিশ জনপ্রত্যাশা ও জনআকাঙ্খা পূরণের জন্য অসীম সাহসিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে অপরাধ দমন করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বসবাসের জন্য নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির কাজে সদা সচেষ্ট বাংলাদেশ পুলিশ।

এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর মহানগরীর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন এবং জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দ্রুত উত্তম সেবা প্রদান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর প্রয়াস সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নগরবাসীর আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠা দিবসে এ ইউনিটের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

কে এম তারিকুল ইসলাম

ডিআইজি
রংপুর রেঞ্জ

বাণী

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রথম বর্ষপূর্তিতে আমি প্রতিষ্ঠানটির সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শুন্য থেকে শুরু করে এক বছরের পথচলা খুব একটা সহজ ছিল না। কিন্ত প্রতিষ্ঠানটির সকল সদস্যের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং সর্বপোরি এর যোগ্য নেতৃত্বের সঠিক দিক নির্দেশনায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইতোমধ্যেই এই অঞ্চলের মানুষের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মানুষকে সহজে ও সহৃদয়তার সাথে পুলিশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করেছিল। দক্ষতা ও সুনামের সাথে সে লক্ষ্য পূরণে দায়িত্বশীলতার সাথে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে সততা, স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সাথে জনগণকে উত্তম পুলিশি সেবা প্রদানের এই অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সকল সূচকেই ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জিত হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য উদাহরণ তৈরী করবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই বাংলাদেশের জন্যই নিজের, সন্তান এবং স্বজনের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। জাতির পিতার ঋণ শোধ করে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ এবং নিরাপদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দায়িত্ব।

দেবদাস ভট্টাচার্য্য বিপিএম

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
শৃংখলা
আস্থা
প্রগতি

বাণী

কমিশনার
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ১ম কমিশনার হিসেবে সম্মানিত রংপুর মহানগরবাসী ও মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

২০১৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর উদ্বোধন করেন। সময়ের চাকা ঘুরে আজ এক বছর পূর্ণ হল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের। যাত্রা শুরুর প্রথম দিন থেকেই একযোগে সকল ইউনিটে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, যা ছিল সে সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ । তখন থেকেই সকল চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্য উদঘাটন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, সিটিএসবি'র ডিজিটালাইজড সেবা প্রদানসহ সকল জাতীয়, ধর্মীয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টসমূহে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে আসছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। মহানগরের সম্মানিত নগরবাসীর জন্য পুলিশি সেবার মান বৃদ্ধি এবং সেবা আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সকল পুলিশ ইউনিটের দৃশ্যমান স্থানে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন, অভিযোগ বক্স স্থাপন, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ও নিজস্ব ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে ও বাংলাদেশ পুলিশের Strategic Plan 2018-2020 টার্গেট বাস্তবায়নে প্রতিটি থানায় সার্ভিস ডেলিভারি ডেস্ক স্থাপন, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু, ঝুকিপূর্ণ গ্রুপ (মহিলা, শিশু, বয়স্ক নাগরিক ইত্যাদি) এর জন্য পৃথক ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ শুধু অপরাধ নিবারণে নয় জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে মাদক, জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ ও গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখে অপরাধ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। ইনসার্ভিস ট্রেনিং এর মাধ্যমে সকল স্তরের কর্মকর্তাদের মাঝে শুদ্ধাচার, আইনের শাসন, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সংবেদনশীল পুলিশি সেবা প্রদানের শিক্ষা ও চর্চা করানো হচ্ছে।

গতানুগতিক পুলিশিং এর পাশাপাশি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ 'মানবতার বন্ধনে রংপুর' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করছে। এছাড়াও রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন, ফ্রি হেল্‌থ চেক-আপ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের চারা বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন, হারাগাছ পৌরসভা, পীরগাছা এবং কাউনিয়া থানার অংশবিশেষ এর সমন্বয়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন করার জন্য সদাশয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আবারো সকৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাই। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি সদস্য নগরবাসীর আস্থা ও আকাঙ্খা পূরণ করে তাদের পাশে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুরের ১ম প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক।

মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
শৃংখলা
আস্থা
প্রগতি

সম্পাদকীয়

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মেট্রোপলিটন পুলিশ পরিবারের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাংলাদেশের পুলিশের সদস্যরা। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের ১২৬২ জন অকুতোভয় বীর সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা, প্রগতি, উন্নয়ন তথা সার্বিক কল্যাণ সাধনে যুগোপযোগী পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আর এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষায়িত নতুন নতুন ইউনিট গঠন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন, আধুনিক প্রশিক্ষণ, জনবল বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের একটি সর্বকনিষ্ঠ ইউনিট হিসাবে এই ইউনিটের যাত্রা শুরু হয়।

সময়ের চাকা ঘুরে ফিরে এলো আবার ১৬ই সেপ্টেম্বর, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অতিক্রম করল গৌরবময় সেবার এক বছর। এই স্বল্প সময়েই মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর মহানগরের অভ্যন্তরীণ শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জঙ্গি-সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূলে মহানগরবাসীর নিকট তথা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্য তাদের সততা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনগণের ভালোবাসা ও আস্থা অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে "প্রগতি" স্মরণিকা সংখ্যাটি। পেশাগত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে স্বল্প সময়ে "প্রগতি" ১ম সংখ্যার প্রকাশ সত্যিই একটি দুরূহ কাজ। যাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও আন্তরিক দিক-নির্দেশনায় সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাদেরকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। যাদের সহযোগিতার কারণে স্মরণিকাটি প্রকাশের পথ সহজতর হয়েছে তাদের প্রতিও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া যারা লেখনীর মাধ্যমে আমাদের এই স্মরণিকাকে ঋদ্ধ করেছেন তাদের প্রতিও রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালোবাসা।

পরিশেষে, অসাবধানতাজনিত যে কোন ভুলত্রুটি এবং সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদের মতো কিছু অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতির জন্য সহৃদয় পাঠকের নিকট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

প্রতিষ্ঠাকালীন মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ

বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ

জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার এক বছর

মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম ●

"সোনার বাংলা"র স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে যে উন্নতির শিখরে দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে টেকসই করার পূর্বশর্ত হলো উন্নত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্বারা সামাজিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা বিধানে প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশের সকল স্থানের সকল নাগরিকের জীবন মান নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দেশের মানচিত্রে উত্তরের জনপদ হিসেবে পরিচিত, রংপুর মহানগর এলাকার জন্য গঠন করেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের একটি নবগঠিত ও সর্বকনিষ্ঠ পুলিশ ইউনিট।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন ও উদ্বোধন ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারি রংপুর জেলা সফরকালে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পর গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ১১৮৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃজন ও ১২৩ টি যানবহন টিওএন্ডই ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশিত হয়। এরপর গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ মহান জাতীয় সংসদে 'রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন-২০১৮' পাশ হয়। রংপুর সিটি কর্পোরেশন, হারাগাছ পৌরসভা, পীরগাছা থানার কল্যাণী ইউনিয়ন ও কাউনিয়া থানার সারাই ইউনিয়ন এর সমন্বয়ে প্রাথমিকভাবে ০৬ টি থানা নিয়ে ২৩৯.৭২ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন করেন। সুদীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের শুভ উদ্বোধন করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আরপিএমপির শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮, নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের একটি সর্বকনিষ্ঠ ইউনিট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

দ্রুততম সময়ে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটসমূহ স্থাপন ও অপারেশনাল কার্যক্রমের সূচনা ঃ

নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধাপে নির্মানাধীন ৪ তলা বিশিষ্ট পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এর অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর যাত্রা শুরু হয়। দোতলার চারটি কক্ষে যথাক্রমে পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ও দুই জন ডিসি বসতেন এবং দোতলার অপর একটি কক্ষে যোগদানকারী সকল সহকরী পুলিশ কমিশনারগণ একসাথে বসে অফিস করতেন। জায়গার সংকুলান না হওয়ায় নিচ তলার ছোট ছোট তিনটি রুমে রিজার্ভ অফিস, একাউন্টস শাখা, প্রধান সহকারী শাখা, গোয়েন্দা শাখা, নগর বিশেষ শাখা এবং ট্রাফিকের কার্যক্রম ভাগাভাগি করে চালানো হতো। পরবর্তীতে আরপিএমপি এর দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজ যাতে স্বাচ্ছন্দে চলতে পারে সেজন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর মহোদয়ের কার্যালয়ের তৃতীয় তলায় পূর্ব পার্শ্বের তিনটি ও প্রার্থনা কক্ষটি মেট্রোপলিটন পুলিশকে দেয়া হয়। বিদ্যমান কক্ষগুলো সংস্কারসহ পুরো তৃতীয় তলার উভয় পাশের ছাদটিতে টিনের ছাউনি দিয়ে আধা-পাকা বিল্ডিং নির্মাণ করে সেখানে তাপ নিরোধক দিয়ে সম্পূর্ণ ফ্লোরে টাইলস্ লাগিয়ে দৃষ্টিনন্দন করে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের অফিসসহ পশ্চিম পার্শ্বে প্রার্থনা কক্ষ নির্মান করে আরপিএমপির হেডকোয়ার্টার্সের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমে তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, ডিআইজি জনাব খন্দকার গোলাম ফারুক পিপিএম, বিপিএম, জেলা প্রশাসক জনাব এনামুল হাবীব এবং পুলিশ সুপার জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পিপিএম অভাবনীয় সহযোগিতা করেছেন। তাদের অবদান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর মহোদয়ের কার্যালয়ের দ্বিতল ভবনটির ছাদে নির্মাণাধীন পুলিশ কমিশনার কার্যালয়

নির্মাণ পরবর্তী বর্তমান পুলিশ কমিশনার কার্যালয়

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ইউনিটসমূহের মধ্যে মূলতঃ কোতয়ালী থানা ছাড়া আর অন্য কোন স্থাপনা উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ববর্তী ইউনিট জেলা পুলিশের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের প্রবেশ পথে সিড়ির দুই পাশে ফাঁকা জায়গায় থাই গ্লাসের ঘেরা দিয়ে প্রসিকিউশন বিভাগ, জেলা পুলিশের সাথে হাজত খানা ও জিআরও অফিস ভাগাভাগি করে কোর্ট পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়।

নিরলস পরিশ্রমের ফলে অতি অল্প সময়ে থানা ও অন্যান্য ইউনিটের রেজিষ্টার পত্র সংগ্রহ ও প্রস্তুত, টেলিফোন, বেতার সরঞ্জামাদি, কম্পিউটার, বিদ্যুৎ, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি সংযোগসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট স্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ উদ্বোধনের প্রথম দিন হতেই থানা পুলিশের সার্বক্ষণিক পেট্রোল ও রণ পাহারা, সিটি এসবির জোরালো নজরদারি, ডিবির মুহুর্মুহু অভিযান, ট্রাফিক বিভাগের নিরলস পরিশ্রমের ফলে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং হেডকোয়ার্টার্স বিভাগ, ক্রাইম এন্ড অপস্ শাখা, কন্ট্রোল রুম ও মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্স এর সক্রিয় কার্যাবলির ফলে জননিরাপত্তা সর্বোতভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। কমিউনিটি পুলিশিং, জনকল্যাণ ও জনসতেচনতামূলক কর্মকান্ডের ফলে পুলিশিং কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা ও আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুলিশি কার্যক্রম শুরু করার জন্য পুলিশ লাইন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। যেখান থেকে পুলিশি কার্যক্রমের প্রায় সকল অপারেশনাল কাজের শক্তি ও রসদ যোগানো হয়। নবসৃষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এদিক থেকে সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে কারণ শহরের সন্নিকটে নিয়ামত মৌজা এলাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজটির কার্যক্রম বন্ধ থাকায় উক্ত স্থাপনাটি পুলিশ লাইন্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভাড়া নেয়া হয়।

পুলিশ লাইন্স, আরপিএমপি (গংগাচড়া রোড), রংপুর

০২টি বিশাল মাঠ, প্রায় ৩০০ জনের রেডিমেট আবাসন সুবিধাসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বসার উপযোগী অফিস কক্ষগুলোতে নবসৃষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্সের চাহিদা উপযোগী করে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) এর কার্যালয় ঃ রংপুর মহানগর এলাকায় উপযুক্ত ভবন ভাড়া না পাওয়ায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ধাপ পুলিশ ফাঁড়িতে ৬তলা ভিত বিশিষ্ট নব নির্মিত ৪তলা ভবনের ২য় তলায় উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) এর কার্যালয় অস্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

গোয়েন্দা অফিস ঃ ধাপ পুলিশ ফাঁড়ির ৩য় তলায় সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি) এর কার্যালয় পরিচালিত হচ্ছে।

ট্রাফিক (উত্তর) অফিস ঃ ধাপ পুলিশ ফাঁড়ির নীচতলায় সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক উত্তর) এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ধাপ পুলিশ ফাঁড়ি ঃ ধাপ পুলিশ ফাঁড়ির নীচতলার ০১টি কক্ষসহ সেমি-পাকা ভবনে পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কোতয়ালী জোন, মাহিগঞ্জ জোন এবং ট্রাফিক (দক্ষিণ) এর কার্যালয় ঃ

কোতয়ালী জোন, মাহিগঞ্জ জোন এবং ট্রাফিক (দক্ষিণ) এর কার্যালয় বর্তমানে আর.কে রোড সংলগ্ন (বগুড়া-সৈয়দপুর রোড) মা ও শিশু হাসপাতালের পার্শ্বে ব্যক্তি মালিকাধীন ৩য় তলা ভবন ভাড়া নিয়ে অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কোতয়ালী থানা ঃ রংপুর জেলা পুলিশের কোতয়ালী থানা ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নিয়ে কোতয়ালী থানার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত ১৩-২৮ পর্যন্ত মোট ১৬ টি ওয়ার্ডের সম্মানী-পুর, দামোদপুর, পীরজাবাদ, বড়বাড়ী, দেওডোবা, মনোহরপুর, গণেশপুর, আলমনগর, বিনোদপুর, হরিরামপুর, ধাপ, কেল্লাবন্দ, ভগী, রামপুরা, পার্বতীপুর, সাতগাড়া, রাধাবল্লভ, রঘুনাথগঞ্জ, কামাল কাছনা মৌজাসমূহ নিয়ে গঠিত কোতয়ালী থানা।

তাজহাট থানা ঃ বর্তমানে মর্ডান মোড়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভাড়া বাড়ীতে থানার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত ১৫, ২৮,২৯,৩১ ও ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের আক্কেলপুর, দর্শনা পাহাড়ী, কিষামত বিষু, শেখপাড়া, তাজহাট, বড় রংপুর, নাজিরদিগড়, পানবাড়ী, আরাজি তামপাট, আরাজি ধর্মদাস, তালুক ধর্মদাস, তালুক তামপাট, নগর মীরগঞ্জ, খোর্দ্দ তামপাট মৌজাসমূহ নিয়ে তাজহাট থানা গঠিত।

মাহিগঞ্জ থানা ঃ রংপুর জেলা পুলিশের সাবেক মাহিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবনে থানার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত ২৯,৩০ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড এবং রংপুর জেলাস্থ পীরগাছা থানাধীন ১নং কল্যাণী ইউনিয়ন এর মাহিগঞ্জ, খোর্দ্দ রংপুর, নাছনিয়া, বীরভদ্র, ছোট রংপুর, আরাজিবন খামার, মন্দিরা, তালুকবকচি, রাজুখা, আজিজুল্লাহ, হোসেন নগর, তালুকরঘু, মেকুরা, কলাবাড়ী, তালুকউপাশু, খামারউপাশু, হরগোবিন্দ, ফতা, তালুকপশুরা, বড়হাজরা, গোদাশিমলা, আবুহাজরা, হরিকল্যাণী, স্বচাষ, বিহারী, ছোটকল্যাণী, ফকিরা (বড় দরগা), তৈয়ব, তালুব কল্যাণী মৌজাসমূহ নিয়ে গঠিত মাহিগঞ্জ থানা ।

হারাগাছ থানা ঃ পৌরসভার মূল ভবন সংলগ্ন পুরনো ২য় তলা ভবন (২৪০০ বর্গফুট) এবং তার সামনের ফাঁকা অংশ ভাড়া নিয়ে থানার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং রংপুর জেলাস্থ কাউনিয়া থানাধীন সারাই ইউনিয়ন ও হারাগাছ পৌরসভার সারাই, ধুমগারা, হারাগাছ, হারাগাছ চতুরা, ঠাকুরদাস, ধুমেরকুঠি, বানুপাড়া, চারুভদ্র, বেনুঘাট, হরিরামমল, বক্সা, গুলালবুধাই, বুধাই, তপোধন, খলিশাকুড়ি, কার্ত্তিক, চাদকুটি, আরাজি গুলালবুধাই, মহাব্বত খাঁ, বধু কমলা, নহাটি কাছনা, বাহার কাছনা, চিলমন, সাহেবগঞ্জ, কাছনা, বিরচরণ, মনাদার, মনগোপাল, রামগোবিন্দ, মাছহাড়ী, উদায় নাারায়ণ মাছহাড়ী, সারঙ্গপুর, আরাজি বীরচরণ খামার, ভগিরথ মাছহাড়ী, মদামুদন, কাঁচু, দরিমদন মোহন মৌজাসমূহ নিয়ে হারাগাছ থানা গঠিত।

পরশুরাম জোন অফিস ও পরশুরাম থানা ঃ সহকারী পুলিশ কমিশনার (পরশুরাম জোন) ও পরশুরাম থানা বর্তমানে রংপুর-গংঙ্গাচড়া রোডের পশ্চিম পার্শ্বে নিয়ামত পান্ডার দিঘি নামক স্থানে ব্যক্তি মালিকানাধীন ২য় তলা ভবন ও সেমিপাকা ভবন ভাড়া নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ২য় তলায় পরশুরাম জোন অফিস এবং নীচতলা ও সেমিপাকা ভবনে থানা অবস্থিত। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিয়ামত, পঁয়ধর, কাইমাগিলি, আমাশু কুকরুল, নীলকণ্ঠ, কুকরুল, বালা কোয়ার, বিনোদ, হারাটি, আরাজিপরশুরাম, দেবোত্তর তালুক, পরশুরাম, কোবারু, বাহাদুর সিংহ, চব্বিশ হাজারী মৌজাসমূহ নিয়ে গঠিত পরশুরাম থানা।

হাজিরহাট থানা ঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ০১ নং ওয়ার্ডের সাবেক উত্তম ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে ০২টি পুরাতন ভবন ভাড়া নিয়ে থানার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত ১, ২, ১০, ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের রণচন্ডি, মনোহর, শেখ তৈয়ব, উত্তম, বারঘরিয়া, হরিরামপিরোজ, অভিরাম, গোয়ালু, পশ্চিম গিলাবাড়ী, পূর্ব গিলাবাড়ী, জগদীশপুর, বখতিয়ারপুর, রাজেন্দ্রপুর, কামদেবপুর, বিন্নাটারী, চক ইসবপুর, পক্ষিফান্দা, ভবানীপুর, রাধাকৃষ্ণপুর, গোপীনাথপুর মৌজাসমূহ নিয়ে হাজিরহাট থানা গঠিত।

নবাবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি ঃ রংপুর জেলার সাবেক নবাবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির সেমি পাকা ভবনে (রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতয়ালী থানার অর্ন্তভূক্ত) নবাবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অফিস ব্যবস্থাপনায় গৃহীত বর্তমান কার্যক্রম ঃ

সদ্য গঠিত ইউনিট হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যেই সকল পুলিশ স্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্স এবং পুলিশ লাইন্সের অন্যান্য স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের নিমিত্তে ব্যক্তি মালিকানাধীন ৩০ একর জমি, মাহিগঞ্জ জোন অফিস এর জন্য ০.৩৩ একর জায়গা এবং প্রতি থানার (মাহিগঞ্জ, হারাগাছ, হাজিরহাট, পরশুরাম এবং তাজহাট) জন্য ০১.০০ (এক) একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব আলাদা আলাদাভাবে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুরের লজিস্টিক ডিপো/সাপোর্ট সেন্টারের স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের নিমিত্তে ০৩.০০ একর, ডাম্পিং স্টেশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী স্থাপনার জন্য ০৫.০০ একর, মোটরযান ওয়ার্কশপ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের নিমিত্ত ০৫.০০ একর এবং ফায়ারিং বাটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের নিমিত্তে ১০.০০ একর জমি পুলিশ বিভাগের অনুকুলে অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। আমরা আশা করছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। অন্যান্য ইউনিটের জন্য জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে প্রশাসনিক অনুমোদন সংক্রান্ত প্রস্তাব তৈরির কাজও চলমান রয়েছে।

জনশৃঙ্খলা রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ঃ

ব্যস্ততম বিভাগীয় শহর রংপুর এর পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রংপুর মেট্রোপলিটনের ট্রাফিক বিভাগ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ট্রাফিক উত্তর ও ট্রাফিক দক্ষিণে দুই জন সহকারী পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলছে। ট্রাফিক উত্তর জোনের- মেডিকেল মোড়, লালকুঠি, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড়, কাঁচারি বাজার, সিটি বাজার, আজাদ হোমিও হল, সুপার মার্কেট, ইন্দ্রার মোড়, মিঠুর গলি, পায়রা চত্তর ও ট্রাফিক দক্ষিণ জোনের- জাহাজ কোম্পানির মোড়, বেতপট্টি মোড়, শাপলা চত্তর মোড়, বদরগঞ্জ রাস্তার মোড়, লালবাগ মোড়, মর্ডান মোড়, সাতমাথা, মাহিগঞ্জ শহীদ মিনার, পার্কের মোড় এ সমস্ত এলাকায় ট্রাফিক অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন ইভেন্ট, জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসবের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রাফিক বিভাগ বাড়তি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে থাকে

e-Traffic prosecution and fine payment system চালু ঃ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিটে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ট্রাফিকিং ব্যবস্থাপনার জন্য গত ১১/১০/২০১৮ খ্রিঃ "e-Traffic prosecution and fine payment system" কার্যক্রম শুরু হয়। ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন ব্যবস্থাপনায় POS মেশিন (Point of Service) এর মাধ্যমে জনগণকে হয়রানির হাত থেকে বাঁচিয়ে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য মোটরযান আইনে মামলা রুজু এবং সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা আদায় করে কাগজপত্র ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন উদ্বোধন

রংপুর মেট্রোপলিটনে চালু করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারনেট ভিত্তিক ট্রাফিকিং সেবা। যা নবসৃষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি অন্যতম সাফল্য। আগষ্ট/২০১৯ পর্যন্ত ৩৯৯ টি বিভিন্ন ধরণের যানবহন জব্দ ও e-prosecution এর মাধ্যমে ৪৪,৫০৯ টি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং মোট ১,৪৮,৪১,৯০০ (এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত) টাকা জরিমানা করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটনের সাথে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সিসি ক্যামেরার সংযোগ (Access) স্থাপন ঃ

রংপুর মহানগরের আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গত ১৪/১১/২০১৮ খ্রিঃ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার সাথে রংপুর মহানগর পুলিশের সংযোগ সাধিত হয়। সিসি ক্যামেরার সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও মেট্রোপলিটন পুলিশ যৌথভাবে বিভিন্ন অপরাধ নিয়ন্ত্রণসহ সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন ও যানজটমুক্ত মহানগর প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আরপিএমপির কন্ট্রোলরুমের সাথে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এর সিসি ক্যামেরার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

কন্ট্রোল রুমের সাথে সিসিটিভি ক্যামেরার সংযোগ স্থাপন

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ঃ

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানসহ জনশৃঙ্খলা রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

- রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ উদ্বোধনের অব্যবহিত পরবর্তী ২০ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র আশুরা উদযাপন উপলক্ষে রংপুর মেট্রোপলিটন এর পুরো এলাকাব্যাপী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে পুলিশ সদস্যদের সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন।

- ১৫/১০/২০১৮ খ্রিঃ হতে ১৯/১০/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় মোট ১৬৫টি পূজামন্ডপে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গাপুজা/১৮ পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় অত্যন্ত আনন্দঘন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন।

- ১৬/১০/২০১৮ খ্রিঃ রংপুর জিলা স্কুল মাঠে "শেকড়ের সন্ধানে" মেগা কনসার্টে পুলিশের দৃশ্যমান উপস্থিতি ও তৎপরতায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন।

- রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানাধীন দমদমা ব্রীজ সংলগ্ন ঘাঘট নদীর পাড়ে লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে ০১/১১/১৮ খ্রিঃ হতে ০৩/১১/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৩(তিন) দিন ব্যাপী রংপুর জেলা ইজতেমা/২০১৮ শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন।

- ২৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্বোধনের মাত্র তিন মাসের মধ্যে কোনো নির্বাচনী সহিংসতা ছাড়া অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যের দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার কারণে নির্বাচন পরবর্তী শান্তি শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতঃস্ফুর্তভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রংপুরবাসীর আস্থা অর্জনের মাধ্যমে নবসৃষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ তথা বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

- পবিত্র মাহে রমজান, শব-ই-বরাত ও ঈদ-উল-ফিতর শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ।

- মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র মাহে রমজান। এই মাসে তারাবির নামাজ পরবর্তী মুসল্লিদের নিরাপত্তা ও ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে মার্কেট, শপিং মল কেন্দ্রিক মানুষের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টহল ও চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়। মেট্রোপলিটন পুলিশের তৎপরতায় কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন।

- পবিত্র ঈদুল আযহা/২০১৯ উপলক্ষে রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকার কোরবানির পশুর হাটসমূহের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ।

- আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন), রংপুর কর্তৃক আয়োজিত শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে ০৪/০৭/২০১৯ খ্রিঃ রথযাত্রা(র‍্যালি) এবং ১২/০৭/২০১৯ খ্রিঃ উল্টো রথযাত্রা (র‍্যালি) চলাকালে এবং রংপুর ধর্মসভা মন্দিরে ৯দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী চলাকালে অনুষ্ঠানস্থলসহ রংপুর মহানগর এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ।

- জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৪/০৭/২০১৯ খ্রিঃ সকাল ০৭:৪৫ ঘটিকার সময় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃতদেহ ১৬/০৭/২০১৯ খ্রিঃ সকাল ১০:৩০ ঘটিকার সময় হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা থেকে রংপুর সেনানিবাসে নিয়ে আসা হয়। রংপুর মহানগরের কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে তার জানাযা সম্পন্ন এবং পল্লী নিবাস প্রাঙ্গণে সেনাবাহিনী কর্তৃক সামরিক মর্যাদায় এরশাদের দাফনকালীন নিরাপত্তা প্রদান ও শৃঙ্খলা রক্ষা।

- ২০/০৭/২০১৯ খ্রিঃ বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, রংপুর মহানগর শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে রংপুর জিলা স্কুল মাঠ ও অডিটরিয়ামে নিরাপত্তা প্রদান।

- জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ ই আগষ্ট ২০১৯ খ্রিঃ সকল সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী ও আপামর জনসাধারণ কর্তৃক দিবসটি উদযাপনে ও র‍্যালিতে নিরাপত্তা প্রদান।

- হিন্দু ধর্মাবলম্বিদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে ২৩/০৮/২০১৯ খ্রিঃ মেট্রোপলিটন এলাকায় নিরাপত্তা প্রদান।

উল্লেখিত জাতীয় দিবসগুলো যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ফোর্স ম্যানেজমেন্ট ঃ

অপারেশনাল পুলিশি কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পুলিশ লাইন্স। এসি ফোর্স ও আর আই অফিস পুলিশ সদস্যদের ডিউটি তদারকির পাশাপাশি ফোর্সের ব্যারাক এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মানসম্মত খাবার ও প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে খেয়াল রাখেন। পুলিশ লাইন্সে সুপেয় পানি সরবারহের জন্য ডিপ টিউবয়েল স্থাপন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সারা দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রকোপ দেখা দিলে পুলিশ লাইন্স ও তার আশে পাশের এলাকায় নিজস্ব ফগার মেশিনের মাধ্যমে এডিস মশা নিধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে পুলিশ লাইন্সের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও সুষ্ঠু রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সমস্যা দূরীকরণে সার্বক্ষণিক জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ফোর্সের কল্যাণ ঃ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে ফোর্সের কল্যাণ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। এ লক্ষ্যে প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পুলিশ লাইন্স মিলনায়তনে সকল স্তরের পুলিশ সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণে কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফোর্সের যে কোন সমস্যা গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। প্রতি কল্যাণ সভায় ফোর্সদেরকে সততা ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়।

তাজহাট থানায় কর্মরত কং/৩৯১ নূরে আলম কর্তব্যরত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের অনুকূলে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল হতে "এককালীন থোক অনুদান" ৫,০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা হয়।

অতি সম্প্রতি কর্তব্যরত অবস্থায় কং/২০৫ মোঃ রবিউল ইসলাম সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হলে তার পরিবারের অনুকূলে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল হতে "এককালীন থোক অনুদান" ৫,০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান ঃ

পুলিশ মেমোরিয়াল ডে এবং স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

পুলিশ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান

অপরাধ চিত্র ঃ

মামলা নিষ্পত্তি- ১৬ অক্টোবর ২০১৮ থেকে ৩১ আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত

রংপুর মেট্রোপলিটন এর রুজুকৃত মামলার সংখ্যা	রংপুর জেলা হতে প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	(আরপিএমপি+ রংপুর জেলা) = মোট মামলার সংখ্যা	সর্বমোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলা নিষ্পত্তির হার
১৪৩৭	১৫৭৮	(১৪৩৭+১৫৭৮) = ৩০১৫	১৯৬৪	৬৫.১৪%

ওয়ারেন্ট নিষ্পত্তি- ১৬ অক্টোবর ২০১৮ থেকে ৩১ আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত

রংপুর মেট্রোপলিটন এর প্রাপ্ত ওয়ারেন্ট	রংপুর জেলা হতে প্রাপ্ত ওয়ারেন্টের সংখ্যা	(আরপিএমপি+ রংপুর জেলা) = মোট ওয়ারেন্টের সংখ্যা	সর্বমোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	ওয়ারেন্ট নিষ্পত্তির হার
৩৩৮৩	৫১১০	(৩৩৮৩+৫১১০) = ৮৪৯৩	৫১৪৬	৫৮.৩২%

মাদক উদ্ধার ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাদকের প্রতি "জিরো টলারেন্স" নীতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মাদক উদ্ধারে ও মাদক নির্মূলে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ।

মাদকদ্রব্য উদ্ধার
(গত ১৬/০৯/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১/০৮/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত)

মামলার সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের নাম	পরিমান (কেজি/লিটার/পিস)
৭৯৪	১। ইয়াবা ২। গাঁজা ৩। হিরোইন ৪। ফেন্সিডিল ৫। চোলাই মদ ৬। বিআর ও হুইচকি ৭। স্প্রিট	১। ১৫,১০৬ পিস ২। ১২৮ কেজি ২৯৫ গ্রাম ও ৯৬ টি পুরিয়া ৩। ৪৩২.৫৩ গ্রাম ও ৮৩ পুরিয়া ৪। ১৩৯৯ বোতল ৫০০ মিলি ৫। ৩৫২৩.৫০ লিটার ৬। ৩৫০ টি ৭। ১৮৫ লিটার

গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন ঃ

অপরাধী গ্রেফতার ও শনাক্তকরণে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর সফলতা ও আন্তরিকতা দেশব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সফলতাসমূহ হলো ঃ

- কোতয়ালী থানাধীন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চাঞ্চল্যকর নবজাতক চুরির ঘটনা উদঘাটন ও অজ্ঞাত আসামীকে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার এবং চুরি যাওয়া নবজাতককে উদ্ধার।

- আন্তঃজেলা দুর্ধর্ষ চোরচক্রকে চোরাই কাজে ব্যবহৃত ট্রাকসহ ব্যাটারী উদ্ধার করতে ঢাকা, খুলনা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়াসহ বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে তাজহাট থানাধীন মডার্ন মোড় এলাকা থেকে চুরি যাওয়া ব্যাটারীসহ ৩ জনকে গ্রেফতার।

- কোতয়ালী থানাধীন মুন্সিপাড়ার চাঞ্চল্যকর সীমা হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন, আসামী গ্রেফাতার, কবর থেকে লাশ উত্তোলন, মামলা রুজু ও যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ।

- সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার ব্যবহৃত সরকারি মোটরসাইকেল নগরীর পায়রা চত্বরের একটি রেস্তোরাঁর সামনে থেকে চুরি হয়। লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে ঝটিকা অভিযানের মাধ্যমে আন্তঃজেলা সংঘবদ্ধ মোটরসাইকেল চুরির সক্রিয় সদস্য ও ৫ টি চোরাই মোটরসাইকেলসহ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার।

- কোতয়ালী থানাধীন সাতগাড়া খলিফা পাড়া থেকে প্রাইভেট কার চুরির সংঘবদ্ধ আন্তঃজেলা সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার ও চোরাই কার উদ্ধার।

- বিক্রয় ডট কমে মোটরসাইকেল বিক্রির বিজ্ঞাপনদাতার মোটরসাইকেল নাটকীয় কায়দায় চুরি হয়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাজিরহাট থানা পুলিশ এর তৎপরতায় ৪ ঘন্টার মধ্যে রংপুর জেলার কাউনিয়া থানা এলাকা হতে অটোরিক্সাসহ মহিলা আসামী গ্রেফতার।

- মাহীগঞ্জ থানায় নাটকীয় কায়দায় ইজিবাইক ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার, পরশুরাম থানায় দরিদ্র রিক্সা চালকের চুরি যাওয়া রিক্সা উদ্ধার।

- গত ০১/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ তাজহাট থানাধীন শিশু অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবীকারী চক্রের সক্রিয় সদস্য গ্রেফতার ও অপহৃত শিশু উদ্ধার।

- ছদ্মবেশী সিরিয়াল রেপিষ্টকে হারাগাছ থানা পুলিশ কর্তৃক অভিনব কায়দায় গ্রেফতার।

- কোতয়ালী থানাধীন পীরজাবাদ জুগিটারী থেকে জাল টাকা তৈরীর সরঞ্জামাদিসহ মোট ১১,৩০,০০০ (এগারো লক্ষ) জাল টাকা ও ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) জাল রুপিসহ আসামী গ্রেফতার।

- নগরীর নবাবগঞ্জ বাজারের কালীবাড়ী মন্দির থেকে কোটি টাকা মূল্যমানের চাঞ্চল্যকর কষ্টি পাথরের মূর্তি চুরির ঘটনায় জড়িত আসামীকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেফতার ও চুরি যাওয়া মূর্তি উদ্ধার।

- রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা শাখা এর তৎপরতা ও অব্যাহত প্রচেষ্টায় রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকার রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসাপাতালসহ ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো এখন দালালমুক্ত।

- নগরীর তাজহাট থানাধীন আলমনগর খেরবাড়ি এলাকার অপহৃত ৫ বছরের শিশু আসিককে উদ্ধার এবং ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবীকারী অপহরণকারীদের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর থানা এলাকা হতে গ্রেফতার।

নগর বিশেষ শাখার কার্যক্রম ঃ

নগর বিশেষ শাখার পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও ডিজিটাল সেবার ফলে গোয়েন্দা কার্যক্রমে ইতিবাচক সফলতা এসেছে। রাজনৈতিক সন্দিগ্ধ ব্যক্তি, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ এবং রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় আগত ভিভিআইপি, ভিআইপিসহ বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব, সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে আর্চওয়ে গেট স্থাপন এবং মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে তল্লাশির মাধ্যমে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও নগর বিশেষ শাখা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনসমূহ ও জামায়াত শিবির কর্তৃক নাশকতামূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে তৎপর আছে।

ইতোমধ্যে নগর বিশেষ শাখা কর্তৃক প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মীগণ গোপন বৈঠকের প্রস্তুতি নেয়ার সময় রংপুর মেট্রোপলিটনের কোতয়ালী থানাধীন নীলকণ্ঠস্থ মুন্সীদ ছাত্রবাসে গত ০৭/০৪/২০১৯ ইং তারিখ অভিযান পরিচালনা করে ০৬ (ছয়) জন ও গত ৩১/০৫/২০১৯ ইং তারিখ বিনোদপুর গ্রামে জনৈক রুবেল মিয়ার বাড়ীতে সমবেত হয়ে গোপন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় অভিযান পরিচালনা করে ০২ (দুই) জন জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মীকে বিভিন্ন ধরণের জিহাদী বই, লিফলেট,ব্যানার, চাঁদা আদায়ের রশিদ রেজিষ্টারসহ গ্রেফতার করে।

গত ০১ বছরে বিদেশী নাগরিকের ৪১৪ টি ভিআর, চাকরি প্রার্থীদের ৩৯১ টি ভিআর, ২৪৪ টি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, ৪৬৮৭ টি পাসপোর্ট তদন্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার মাধ্যমে সিটিজেন চার্টারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়েছে।

কল্যাণ ফান্ড গঠন ঃ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুরের জানুয়ারী/১৯ মাসে অনুষ্ঠিত কল্যাণ সভায় উত্থাপিত প্রস্তাব মোতাবেক কোন পুলিশ সদস্য দূর্ঘটনায় আহত বা রোগাক্রান্ত হলে তার সু-চিকিৎসার নিমিত্তে অনুদানের জন্য রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কল্যাণ তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং কল্যাণ তহবিলের পরিধি, কার্যক্রম ও পরিচালনার নীতিমালা তৈরির জন্যে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। কমিটি ইতোমধ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ "কল্যাণ তহবিল নীতিমালা ২০১৯" প্রণয়ন করেন এবং সে মোতাবেক কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অফিসার্স কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি ঃ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এর জানুয়ারী/২০১৯ মাসের কল্যান সভার কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত POHS (পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাই-টি) এর আদলে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তাদের জন্য একটি হাউজিং সোসাইটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমবায় সমিতি আইন-২০০১ অনুসারে "রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড" এর উপ-আইন প্রণীত ও নিবন্ধিত হয়। এই সমিতির বর্তমান কার্যক্রম পুলিশ কমিশনার কার্যলয়, রংপুর থেকে পরিচালিত হচ্ছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত এএসআই থেকে উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তা এ সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারবেন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা মোট ৮৪ জন।

ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক RPMP website, কর্মবন্টন নির্দেশিকা ও সিসিটিভি উদ্বোধন ঃ

বাংলাদেশ পুলিশের অভিভাবক সম্মানিত ইন্সপেক্টর জেনারেল ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার) মহোদয় ৩০ শে জুন, ২০১৯ রংপুর মেট্রোপলিটন কমিউনিটি পুলিশিং সমাবেশে যোগদান করেন। এই একই সফরে তিনি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর ও পুলিশ লাইন্স পরিদর্শন করেন এবং রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ওয়েবসাইট, কর্মবন্টন নির্দেশিকা ও সিসিটিভি উদ্বোধন করেন।

আইজিপি মহোদয় কর্তৃক কর্মবন্টন নির্দেশিকা উদ্বোধন

আইজিপি মহোদয় কর্তৃক সিসিটিভি উদ্বোধন

কমিউনিটি পুলিশিং আরপিএমপি কমিটির অভিষেক ও সমাবেশ ঃ

জনসম্পৃক্ততা ও জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জনগণের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধির জন্য সমাজ থেকে পুলিশভীতি ও অপরাধভীতি দূর করা প্রয়োজন। পুলিশ ও জনতার অংশী-দারিত্বের মধ্য দিয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনের হার কমানো সম্ভব। আর সেজন্য দরকার প্রতিরোধমূলক পুলিশিং ব্যবস্থা। যার অপর নাম কমিউনিটি পুলিশিং।

রংপুর মেট্রোপলিটন কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠিত হওয়ার পর থেকে পুলিশ ও জনতার অংশগ্রহণে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভা ও প্রচার প্রচারণা চালিয়ে আসছে। ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়ের সদয় উপস্থিতিতে কমিউনিটি পুলিশিং আরপিএমপি কমিটির অভিষেক ও সমাবেশ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম ঃ

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার, কমিশনারসহ সকল অফিসারের হোয়াটস অ্যাপে সংযুক্তি, প্রতিটি ইউনিটে সিসিটিভি স্থাপন এবং প্রতিটি ইউনিটের সাথে কমিশনার আফিসের সিসি ক্যামেরার সংযোগের মাধ্যমে ইউনিটের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি শাখার কর্মবন্টন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নামে ফেসবুকে জনসম্পৃক্ততার ফলে যে কোন কাজে জনমতামতকে গুরুত্ব প্রদান এবং আইজিপি ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার) মহোদয় কর্তৃক রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের নিজস্ব ওয়েবসাইট উদ্বোধনের ফলে ডিজিটালাইজড মেট্রোপলিটন গঠনের অগ্রগতির নতুন ধাপ সূচিত হয়েছে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ঃ

নারী নির্যাতন দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম প্রধান বাধা। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ও নির্যাতিত নারী ও শিশুদের সকল প্রকার আইনি সহযোগীতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্যাতনের শিকার ভিকটিমকে সুরক্ষা ও আশ্রয় প্রদানের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় একটি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের "নারী নীতি ২০১১" অনুযায়ী নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও নারীর ক্ষমতায়নে "ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার" বাংলাদেশ পুলিশের একটি অনন্য উদ্যোগ।

মার্চ/১৯ হতে আগষ্ট/১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৮০ জন ভিকটিমকে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছে। (নারী- ২৫,শিশু মেয়ে-৪৪, ছেলে-১১)

অন্যান্য সেবাসমূহ ঃ

বাংলাদেশ পুলিশের স্ট্র্যাটেজিক প্লান ২০১৮-২০২০ এর আওতায় Service Delivery Management এর টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য ঃ

- জন হয়রানি রোধকল্পে ও সেবার মান বৃদ্ধির জন্য সকল থানায় পেশাগতভাবে দক্ষ অফিসারদের দ্বারা সুসজ্জিত 'সার্ভিস ডেলিভারি ডেস্ক' স্থাপন করা হয়েছে।
- সকল পুলিশ স্টেশনে ঝুকিপূর্ণ গ্রুপ (মহিলা, শিশু, বয়স্ক নাগরিক ইত্যাদি) এর জন্য পৃথক পৃথক ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- দ্রুততম সময়ে পুলিশি সেবা প্রদানের জন্য পুলিশ কমিশনার কার্যালয়ে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' চালু করা হয়েছে।
- সকল ইউনিটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

APA ঃ

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার প্রত্যয়ে একটি কার্যকর দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সকল মন্ত্রণলায়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরের সাথে ৩০ শে জুন ২০১৯ খ্রিঃ প্রথম বারের মতো ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে ৫ সদস্য বিশিষ্ট এপিএ টিম গঠন করা হয়েছে। যারা নিয়মিত এপিএ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

শুদ্ধাচার ঃ

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ রাষ্ট্রকে দূর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য এ লক্ষ্যে সরকার অক্টোবর ২০১২ তে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Intrigity Strategy of Bangladesh) প্রণয়ন করেন। শুদ্ধাচার চর্চা ও দূর্নীতি প্রতিরোধে ইনসার্ভিস ট্রেনিং এর মাধ্যমে সকলস্থরের পুলিশ সদস্যদের এ বিষয়ে জ্ঞানদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নের্তৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ ঃ

পুলিশিং কার্যক্রমের ব্যস্ততার মাঝেও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নানাবিধ সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। মানুষের সকল বৈশিষ্টের মধ্যে মানবতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। অসহায়, বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত ও রোগ শোকাগ্রস্থ মানুষের কল্যাণে নিঃশর্তভাবে আন্তরিকতার সাথে কাজ করাই হলো মানবতা।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর পরিকল্পনা ও ঐকান্তিক প্রয়াসের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ রেস্তোরা মালিক সমিতি রংপুর এর অংশগ্রহণে ও কমিউনিটি পুলিশিং এর সার্বিক সহযোগিতায় 'মানবতার বন্ধনে রংপুর' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি মাননীয় বানিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, সংসদ সদস্য, রংপুর-৪ মহোদয়ের উদ্বোধনের মাধ্যমে গত ৮ মে ২০১৯ খ্রিঃ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। যার মাধ্যমে প্রতিদিন ৮০ থেকে ১০০ জন সুবিধা বঞ্চিত শিশুর এক বেলা আহারের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১২ টি নলকূপ স্থাপন, শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সামাজিক দায়বদ্ধতার অনন্য দৃষ্টান্ত।

হাজিরহাট থানা এলাকায়
আরপিএমপির অয়োজনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা

গরিব ও দুস্থ রোগীদের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকার বিভিন্নস্থানে ও বিভিন্ন সময়ে মেট্রোপলিটন পুলিশের আয়োজনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়।

মেট্রোপলিটন পুলিশের চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

- নবগঠিত ইউনিট হিসেবে পুলিশ কমিশনার কার্যালয়, ৬টি থানা, পুলিশ লাইন্স, ডিবি অফিস, ফাঁড়ি, এসি অফিস সমূহ ও ট্রাফিক অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা।
- অফিসার ও ফোর্সের আবাসন সমস্যা নিরসন করা।
- মেট্রোপলিটন কোর্ট চালু করা।
- অফিস ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ফার্নিচার ও অন্যান্য সরঞ্জমাদির অপ্রতুলতা নিরসন করা।
- ফোর্সের স্বল্পতা দূর করা।
- আরপিএমপি এর নিজস্ব মেডিকেল ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা।
- সড়ক ও মহাসড়কে যান চলাচলে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আনয়ন করা।
- আকস্মিক দূর্যোগ মোকাবিলা করা।
- অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ করা।
- বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের সাথে সাথে নতুন অপরাধসমূহ মোকাবেলা করা।
- ধর্মীয় উগ্রবাদ মোকাবেলা, জঙ্গী দমন, সাইবার অপরাধের উদ্‌ঘাটন, টার্গেটেড ক্রাইম প্রতিরোধ, বিদেশি নাগরিকদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান ও রাজনৈতিক সহিংসতা নিরসনকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ

- সকল পুলিশ ইউনিটসমূহের জন্য প্রেরিত জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব মোতাবেক দ্রুত সকল স্থাপনা নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করা।
- রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে আরো জনবল বৃদ্ধি করা।
- রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অধিক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা।
- স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্যান ফান্ড গঠন করা।
- রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাইটির কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা।
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার চালু করা।
- মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য হাসপাতাল স্থাপন করা।

জনসম্পৃক্ততা, জনসচেতনতা, জনসেবা ও জবাবদিহিতা হোক রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের চলার পথের পাথেয়।

শৃঙ্খলা-আস্থা-প্রগতি
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে প্রথম যারা

পুলিশ কমিশনার

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রথম কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম ২৯ জুলাই ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ২৫ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে বিএসসি এজি ইকন (অনার্স) ও কৃষি অর্থনীতিতে এমএসসি এবং পরবর্তীতে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ থেকে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে ১৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি নড়াইল, নোয়াখালী ও মৌলভীবাজার জেলার পুলিশ সুপারসহ ডিএমপি, এসবি ও পুলিশ সদর দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইতালীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ সম্মাননা বিপিএম সেবা পদকে ভূষিত হন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পূর্ব-তিমুর এবং কঙ্গোতে দায়িত্ব পালন করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার

প্রথম অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান ৩ জুলাই ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে গণিতে বিএসসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৬ সালে এইচআরএম-এ মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ১৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি সাতক্ষীরা জেলার পুলিশ সুপারসহ ডিএমপি, সিএমপি, এসবি ও সিআইডিতে কর্মরত ছিলেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সুদান, কঙ্গো এবং হাইতিতে দায়িত্ব পালন করেন।

উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন)

প্রথম উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম ৮ মে ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৮ জুলাই গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে ইংরেজীতে স্নাতক ও ২০০১ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৫ সালে ২৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। পূর্ব-তিমুর ও দারফুর সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেন।

উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ)

প্রথম উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) জনাব কাজী মুত্তাকী ইবনু মিনান ৯ জুন ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৩ সালের ১০ জানুয়ারি ঝিনাইদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে ১৯৯২ সালে বিএ এবং ১৯৯৮ সালে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৫ সালে ২৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তিনি সুদানে দায়িত্ব পালন করেন।

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি)

প্রথম অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি) জনাব মোছাঃ শামিমা পারভীন (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ৩০ জুন দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে স্নাতক এবং ১৯৯৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৬ সালে ২৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। হাইতিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেন।

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ)

প্রথম অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ কাওছার পিপিএম-সেবা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ১৫ জুন বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে প্রাণ রসায়নে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৬ সালে ২৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। আইভরিকোস্ট এবং মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে পিপিএম সেবা পদকে ভূষিত হন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন) জনাব মোঃ জমির উদ্দিন ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৭ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ২ মার্চ কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ২০১১ সালে ডিভিএম ডিগ্রী এবং ২০১৩ সালে থেরিওজেনোলজিতে এম.এস ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০১৬ সালে ৩৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে কারমাইকেল কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স এবং ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। তিনি এ্যাঙ্গোলা'তে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ফোর্স)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (ফোর্স) জনাব এ, কে, এম ওহিদুন্নবী ২০ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ২০১২ সালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০১৬ সালে ৩৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) জনাব মোঃ ফরহাদ ইমরুল কায়েস ৩১ মে ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯১ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (কোতয়ালী থানা)

কোতয়ালী থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ রেজাউল করিম ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯০ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (তাজহাট থানা)

তাজহাট থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব শেখ রোকোনুজ্জামান ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। খুলনা বিএল কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (মাহিগঞ্জ থানা)

মাহিগঞ্জ থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান প্রধান ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাটগ্রাম ডিগ্রী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (হারাগাছ থানা)

হারাগাছ থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে লালমনিরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯২ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (পরশুরাম থানা)

পরশুরাম থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ মোহছে-উল-গনি ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০০১ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (হাজিরহাট থানা)

হাজিরহাট থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব একেএম নাজমুল কাদের ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে গাইবান্ধা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কারমাইকেল কলেজ থেকে বিএসএস (অনার্স) ও এমএসএস ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০০৬ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

নগর ইন্টেলিজেন্স অফিসার (১)

জনাব হিল্লোল রায় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. সিআইও-১ হিসেবে আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০০৮ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

কোর্ট ইন্সপেক্টর

জনাব সামিউল ইসলাম ২৬ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. কোর্ট ইন্সপেক্টর হিসেবে আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কারমাইকেল কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০১১ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

রিজার্ভ ইন্সপেক্টর

জনাব মোঃ আফছার আলী সরকার ৩১ জুলাই ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬১ সালে গাইবান্ধা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

২৫ মার্চের কালরাত: পুলিশের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক •

১৯৭০ সালের সাধারন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়। ১৯৭১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভার (জাতীয় পরিষদের) অধিবেশন আগামী ৩ মার্চ ঢাকায় বসবে।

পশ্চিম পাকিস্তানে তখন চলছিল গভীর ষড়যন্ত্র। লারকানায় ভুট্টোর বাসভবনে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া গোপন এ ষড়যন্ত্রে মিলিত হন জেনারেল ইয়াহিয়া, ভুট্টো, লে. জেনারেল পীরজাদা ও আরো কয়েকজন শীর্ষ জেনারেল। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়া এবং তাঁর ৬ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ বেলা ১টা ৫ মিনিটে দেশবাসীকে স্তম্ভিত করে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন (যা' ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল) অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষুব্ধ মানুষের ঢল নামে। মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হতে থাকে ঢাকাসহ সারাদেশ। অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কলকারখানা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা শহর মূহুর্তে পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। তাঁদের কণ্ঠে তখন শ্লোগান 'জয় বাংলা', পদ্মা-মেঘনা-যমুনা– তোমার আমার ঠিকানা', 'তোমার দেশ আমার দেশ– বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর' ইত্যাদি।

এদিন, এসময় ঢাকা স্টেডিয়ামে কমনওয়েলথ ক্রিকেট টিমের সাথে পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের খেলা চলছিল। ইয়াহিয়ার ঘোষণা রেডিওতে শোনামাত্র দর্শকদের একাংশ জাল টপকে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে ব্যাট, বল, স্ট্যাম্প, প্যাড ও ম্যাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী শহীদ রুমীর মতে "একটার সময় স্টেডিয়ামে ছিলাম। ... অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা যেই না কানে যাওয়া অমনি কি যে শোরগোল লেগে গেল চারিদিকে। মাঠভর্তি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার দর্শক সবাই 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ল। ... ছেলেরা সবাই ক্লাস থেকে, হল থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বটতলায় জড়ো হতে শুরু করেছে। ... ছেলেরা পিলপিল করে আসছে চারদিক থেকে। মনে হলো একেকটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বটতলায়।

এদিন সকাল থেকেই দিলকুশায় হোটেল পূর্বাণীতে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের নিয়ে মিটিং করছিলেন। বাইরে তখন ছাত্রদের মুখে গগণবিদারী শ্লোগান। বঙ্গবন্ধু মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে এসে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন। তিনি বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার সামনে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, আগামী ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পরবর্তী কর্মসূচি জানানো হবে। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ২ মার্চ হরতাল চলাকালে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' ছাত্র সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ গণসমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম

পরিষদ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' ঘোষণা করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক' হিসেবেও ঘোষণা প্রদান করে।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে পূর্ব নির্ধারিত জনসভায় লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে ঘোষণা করেন যে, 'তোমাদের যা' কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

তারপর বাংলাদেশ (তখনো পূর্ব পাকিস্তান) চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত আদেশ-নির্দেশ, তাঁর অসহেযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি স্বতস্ফূর্তভাবে জনগণ পালন করতে থাকে। ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের যে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন সেখানে ৩(খ) তে উলেখ ছিল 'পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর আইন-শৃংখলা রক্ষা করবেন, প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন।' ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ থেকে আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু এ আলোচনা-বৈঠক ছিল কালক্ষেপণ মাত্র। আলোচনা-বৈঠকের নাম করে আসলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ইতোমধ্যে পাকিস্তানি জেনারেলরা এদেশের জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য অত্যন্ত গোপনে তৈরি করে বাঙালি হত্যার নীলনকশা– 'অপারেশন সার্চলাইট'। গোপনে খুনী জেনারেলরা সিদ্ধান্ত নিলেন ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করে করাচির মাটিতে পৌছা মাত্র ঢাকায় শুরু হবে সামরিক অভিযান। 'প্রেসিডেন্টের ঢাকা ত্যাগ অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য একটি ছোট নাটক করা হয়– প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিকেলে 'ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে' চা পান করার জন্য চলে যান। প্রেসিডেন্টের গাড়ি বিউগল বাজিয়ে আবার প্রেসিডেন্ট ভবনে ফিরে আসে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট গাড়িতে ছিলেন না। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিমানে আরোহন করার জন্য পি.এ.এফ গেটে প্রবেশ করেন তখন উইং কমান্ডার খন্দকার তাঁর অফিস থেকে এ দৃশ্য দেখে ফেলেন এবং তিনি এ সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে মুজিবকে জানিয়ে দেন। ... বঙ্গবন্ধু ছাত্রনেতা এবং দলীয় শীর্ষ নেতাদের নিয়ে তাৎক্ষণিক আলোচনায় বসেন এবং সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলেন। দলীয় সহকর্মীগণ বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা ত্যাগের জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু মুজিব বাসভবন ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। তিনি তাঁদের বলেন, 'যদি পাকিস্তান আর্মি তাঁকে বাসায় না পায় তাহলে ঢাকা শহর ধ্বংস করবে এবং হাজার হাজার লোককে হত্যা করবে'।

২৪ মার্চ মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী কমান্ডো ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল জহির আলম খানকে নির্দেশ প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার জন্য। তারা দুজনই পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেন-ারেল হামিদের কাছে যান। জেনারেল হামিদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের নির্দেশ অনুমোদন করেন এবং সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, 'গ্রেফতারের সময় শেখ মুজিবের গায়ে যেন একটিও আঁচড় না লাগে। কমান্ডো বাহিনী রাত ১২টায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে পৌছায় এবং ভীতি প্রর্দশনের জন্য এস.এম.জির বাস্ট ফায়ার এবং একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। নির্ভীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাড়ির দরজা খুলে বের হন। কমান্ডো বাহিনীর অধিনায়ক কর্ণেল জহির বঙ্গবন্ধু মুজিবকে স্যালুউট করে জানায় যে, তার উপর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। তৎপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর তৈরী হবার জন্য কিছুক্ষণ সময় চেয়ে নেন। এরমধ্যেই দ্রুত তিনি ই,পি,আর এর ওয়্যারলেস যোগে স্বাধীনতার ঘোষনা চট্টগ্রামে জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দেন। '.. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাত একটার পর কমান্ডোদের কাছে আত্মসমর্পন করেন। ... রাত ১টা ৩০ মিনিটে ৫৭ ব্রিগেডের মেজর জাফর বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে 'অপারেশন সার্চলাইট' এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেনাবাহিনীর সবাইকে এবং সেনাসদরে জানিয়ে দেন যে, 'বড় পাখিটি (বঙ্গবন্ধু) খাঁচায় পোরা হয়েছে, অন্যরা (আওয়ামী লীগ শীর্ষ নেতারা) নীড় ছেড়ে ভেগেছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তদানীন্তন জনসংযোগ কর্মকর্তা কর্ণেল সিদ্দিক সালিক ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতের কথা লিখেছেন যে, 'ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রথম প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় ফার্মগেটে।

ব্যারিকেডের ওপার থেকে শত শত আওয়ামী লীগার 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে 'জয় বাংলা' স্লোগানের সঙ্গে রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনলাম। একটুপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গর্জন বাতাসে ভেসে এলো। গোলাবর্ষণ এবং স্লোগানের মিশ্র শব্দ শোনা গেল। এল,এম,জি এবং ভারী অস্ত্রের গোলাগুলির শব্দ বৃদ্ধি পেতে থাকল। ... সেনাবাহিনী শহরের দিক অগ্রসর হতে থাকল। অস্ত্রের জয় হলো। লাশের উপর দিয়ে হেঁটে আমাদের সেনাবাহিনী ঢাকাকে কব্জা করে ফেলল। ..গোলাবর্ষণের ফলে আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা, একেক সময় আগুনের হল্কা এবং ধোঁয়া তারার দিকে সম্প্রসারিত আকাশের মেঘকে গ্রাস করে ফেলছিল। ... সেনা সদরের কন্ট্রোল রুম থেকে কোনো সেনা কর্মকর্তাকে হত্যাযজ্ঞে উৎসাহ দিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবরার বলছেন, 'দেয়ার ইজ নো কোশ্চেন অব টেকিং প্রিজনার। দে আর শুটিং অ্যাট ইউ, সো ওয়াইপ দেম অব"।

২৫ মার্চের ভয়াল সেই কালরাত্রিতে গণহত্যার জন্য প্রণীত 'অপারেশন সার্চলাইট' এর অন্যতম টার্গেট ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন। এদিন দুপুর থেকেই বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে রাজারবাগ পুলিশ কন্ট্রোল রুম জানতে পারে যে, যে কোন মুহূর্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদেরকে নিরস্ত্রীকরণ করতে আসবে। কিন্তু তাদেরকে হত্যা বা নির্মূল করা হবে এ ধারনা তাদের ছিলনা। সেনাবাহিনীর গতিবিধি বুঝার জন্য .. পুলিশ কন্ট্রোলরুম থেকে সারা শহরে পেট্রল পার্টি পাঠানো হয়। এদিন বিকেল ৪টায় পুলিশ কন্ট্রোলরুমে সংবাদ আসে যে, মিরপুর, তেজগাঁ, মোহাম্মদপুর প্রভৃতি এলাকায় অবাঙালিরা আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাত ১০ টায় সংবাদ আসে যে, সেনাবাহিনীর একটি বড় দল ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত ১০.৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় টহলরত পুলিশ পেট্রোল পার্টি জানায় যে, রমনা পার্কের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সেনাবাহিনীর অন্তত: ৭০/৮০ টি সাঁজোয়া যান পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাত ১১টায় এসব সাঁজোয়া যান ঢাকা শহরের বিভিন্ন দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে এ সংবাদ আসা মাত্র পুলিশ সদস্যরা যে যার মত প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। রাত ১১.২০ মিনিটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া যানগুলি 'রাজারবাগ পুলিশ লাইনের চারদিকে অবস্থান নেয়। পুলিশ কন্ট্রোলরুম থেকে সারাদেশের পুলিশের বেতার মারফত জানানো হয় যে, "Base for all station of East Pakistan Police, Keep listening, watch, We are already attacked by the Pakistan Army, try to save yourself, over" .. রাত ১১.৩০ মিনিটে 'রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অবস্থানরত পুলিশ সদস্যরা অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে ফেলে। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যবৃন্দ পুলিশ লাইনের চারদিকে, ব্যারাকের ছাদে, বিভিন্ন দালানের ছাদে এবং একটি গ্রুপ বাংলা মোটরে অবস্থান নেয়। ১১.৪০ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাদের কনভয় রাজারবাগ পুলিশ লাইনের মেইন গেটে এসে পৌঁছে। ..রাত ১১.৪৫ মিনিটে রাজারবাগ লাইন্সের দক্ষিণ ও দক্ষিণ - পূর্ব দিক থেকে প্রথম গুলিবর্ষণ হয়। প্রায় সাথে সাথেই প্যারেড গ্র্যাউন্ডের উত্তর পূর্বদিকের শাহজাহানপুর ক্রসিং ও মালিবাগ ক্রসিং থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। ব্যারাকের ছাদে অবস্থানরত বাঙালি পুলিশ সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। শুরু হয় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। ..বাঙালি পুলিশ সদস্যদের মরণপণ প্রতিরোধে থমকে যায় ট্যাংক ও কামান সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনী। একটু পর মর্টার ও হেভী মেশিনগান দিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে তারা। পি আর এফ এর ৪টি ব্যারাকে আগুন ধরে যায়। এই আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৮'শ। রাত ১২.৩০ মিনিটে পাকিস্তান বাহিনীর ভারী অস্ত্রের মুখে বাঙালি পুলিশ সদস্যরা সম্মুখ যুদ্ধের পরিবর্তে গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে। অনেক পুলিশ সদস্য অস্ত্র গোলাবারুদসহ মালিবাগ, চামেলিবাগ প্রান্ত দিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ..রাত ১১.৪৫ মিনিট থেকে শুরু হওয়া প্রতিরোধ যুদ্ধ থেমে থেমে চলতে থাকে রাত ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। বাঙ্গালী পুলিশের কিছু সূর্যসন্তান বুকে অসীম সাহস নিয়ে সমান তালে লড়ে চলে ট্যাংক, কামান আর মর্টারের বিরুদ্ধে। রাত ৩.৩০ মিনিটে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধরত ১৫০ জন বাঙ্গালী পুলিশ সদস্যকে বন্দি করে। কিছু বীর বাঙ্গালী পুলিশ অস্ত্র গোলাবারুদসহ রাজারবাগ ত্যাগ করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলে।

ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতির অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র মতিয়া চৌধুরী বলছেন, "১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বিকেলের দিকে আমি খিলগাঁওয়ে খালার বাসায় আসি। পরে আমি মাটির মসজিদের কাছে ফুফুর বাসায় ... ফুফুর বাসা থেকে তখন রাজার বাগ পুলিশ লাইন্স দেখা যেত। ... সন্ধ্যার পর উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। ছাত্র-জনতা রাস্তায় এবং ঢাকার

গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে ব্যারিকেড দিতে শুরু করছে। উত্তাল আর উৎকণ্ঠার সে এক চরম মুহূর্ত। কারণ ততক্ষণে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। রাজারবাগে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মর্টার, গ্রেনেড আর ভারী অস্ত্রশস্ত্রের গুলি তখন কানে আসছে। একই সাথে কানে আসছিল রাজারবাগস্থ পুলিশের থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলির শব্দ। তৎকালীন পুলিশের কাছে আধুনিক কোন অস্ত্র ছিল না। বাঙ্গালী জাতির মতো পুলিশও ছিল পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যের শিকার। .. রাজারবাগের হাজার হাজার পুলিশ ওই থ্রি নট থ্রি দিয়েই যুদ্ধ করে আধুনিক আর ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী আর্মির বিরুদ্ধে। পুলিশ ইচ্ছে করলে সেদিন পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু তারা পালায়নি। বরং বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে তারা উজ্জীবিত হয়েছিলো পাকিস্তানি হানাদারদের রুখে দিতে। সমরাস্ত্রে তারা দুর্বল হলেও মানসিক শক্তিতে তারা ছিল সবল, উজ্জীবিত। ..পাকিস্তানি সেনারা পুলিশের প্রথম প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে। তারা আকাশের দিকে ট্রেসার বুলেট ছুঁড়ে চারদিক আলোকিত করে নিচ্ছিল। তারপর সেই আলোয় পুলিশের অবস্থান লক্ষ্য করে একে একে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। পুলিশও তার পাল্টা জবাব দিতে থাকে। ..পুলিশ সদস্য যাঁরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তাদের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং পাকিস্তানি আর্মিদের ভারী গোলাবর্ষণ শুরু হলে পুলিশের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ..তখন গোলাগুলিতে অনেক পুলিশ নিহত এবং আহত হয়।

একাত্তরের শহীদ সাংবাদিক (দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক) সিরাজুদ্দিন হোসেনের ছেলে শাহীন রেজা নূর লিখেছেন, "রাজারবাগের কোল ঘেঁষে অবস্থিত চামেলীবাগের একটি একতলা বাসার ভাড়াটিয়া ছিলাম আমরা তখন। ...আমরা তরুণ ও যুবকরা চামেলীবাগের গলি থেকে বের হয়ে শান্তিনগর ও মালিবাগ মোড়ের মাঝামাঝি অবস্থান নিচ্ছিলাম আর 'জয় বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা - মেঘনা - যমুনা' ইত্যকার শ্লোগান দিচ্ছি আর রাস্তার দুধারে পরিত্যক্ত যা কিছু পাচ্ছি তাই দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করছি। গোটা ঢাকাতেই তখন ব্যারিকেড সৃষ্টির জন্য রাস্তায় রাস্তায় লোক নেমে গেছে। .. রাত্রি আনুমানিক ১০ টায় শত শত পাকিস্তানি কনভয় রাস্তায় নেমে পড়ল। ইতোমধ্যে সব এলাকার বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগ তারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ইতোসময়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে শত শত পোষাকধারী পুলিশ হাতে থ্রি নট থ্রি রাইফেল আর কিছু এ্যামুনেশন ও ওয়্যারলেস নিয়ে চামেলীবাগের বিভিন্ন বাড়ির ছাদে অবস্থান নিতে শুরু করে। .. দৃঢ় প্রত্যয়ী ঐ পুলিশ ভাইয়েরা শত্রুর মোকাবেলা করতে বদ্ধপরিকর তখন। আধুনিক সামরিক সম্ভারে সমৃদ্ধ পাকিস্তানি বর্বরদের মোকাবেলায় ঐ থ্রি নট থ্রি নস্যি একথা কারুর মাথায়ই নেই। স্বাধীনতার উদ্বেল আকাঙ্খাজনিত কারণে আর দেশপ্রেমে চিত্ত প্রজ্জ্বলিত থাকার দরুন। .. খানিক বাদেই পাকিস্তানি হানাদারদের নানাবিধ কামান - মেশিনগান - স্টেইনগান ও অন্যান্য সামরিক উপকরণগুলি গর্জে উঠল। আকাশে দীপ্তিময় আলো ছড়ানো এক প্রকার বুলেট মূহুর্মূহু নিক্ষেপ আর এর ক্ষণপ্রভায় রাস্তার দুধারের ঘড়বাড়ি, দোকানপাটে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ আর বাজারঘাটে অগ্নিসংযোগ করে চললো তারা। চামেলীবাগের বাসাগুলির ছাদে অবস্থানরত পুলিশ ভাইয়েরা ঐ ক্ষুদ্র রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে লাগল শত্রুদের গাড়ির বহর লক্ষ করে। আর একটি থ্রি নট থ্রি'র বুলেটের প্রত্যুত্তরে হাজার হাজার গুলি বর্ষণ করে চলছিল হানাদারেরা। .. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া ও পদাতিক সেনারা ঢাকাকে মৃতনগরীতে পরিনত করার মরনখেলায় শামিল তখন। পুলিশ ভাইয়েরা তাদের ঐ যৎকিঞ্চিত সামরিক সামর্থ্যকে সম্বল করে হানাদারদের মোকাবেলা কওে চলেছে বটে কিন্তু তা' যে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচন্ড ও বীভৎস উলাসপূর্ণ আক্রমনের সামনে ছিল যৎসামান্য সে কথাতো বলাই বাহুল্য। তবু ঐ সৈন্যদের সঙ্গে বুঝতে পুলিশ ভাইদের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে যে প্রতিরোধ সে রাতে করেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তা' এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয়া একজন পুলিশ সার্জেন্ট মো. মর্ত্তুজা হোসেন লিখেছেন, ''রাত ১২টার কিছু পূর্বেই পাকিস্তানি সেনারা রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স আক্রমন করে। রাজারবাগে বাঙালী সদস্যরা আক্রমনের আশংকায় পূর্ব হতেই হাতিয়ার সহ প্রতিরক্ষা অবস্থানে প্রস্তুত ছিল। .. প্রতি উত্তরে পুলিশ বাহিনীর হাতের রাইফেলগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠলে বহু পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পাকিস্তানি সেনারা হতাহতদের ট্রাকে উঠিয়ে পিছু হটে। পাকিস্তানি সেনাদের এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদের মনোবল বেড়ে যায় কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে ট্যাংক ও যাবতীয় ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেপরোয়াভাবে আমাদের আক্রমন করে। আমরা সামান্য থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে অজেয় মনোবল নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করি। পাকিস্তানি

সেনারা মরিয়া হয়ে মর্টারের গোলা ছোঁড়ে এসবি বিল্ডিং লক্ষ্য করে। গোলা ছোঁড়া হয় প্রধান বিল্ডিং লক্ষ্য করে। এতে রিজার্ভ অফিসের মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং যাবতীয় রেকর্ডপত্র ভস্মীভূত হয়। .. তারপরও আমাদের অজেয় মনোবল ও দূর্জয় প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি সেনারা ট্যাংক, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ও পুলিশ লাইন্সের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারায় রাত আনুমানিক ৩টায় রাস্তার পাশে অবস্থিত ৫টি টিনশেড ব্যারাকে অগ্নিসংযোগ করে। মূহুর্তের মধ্যে ব্যারাকের সর্বত্র আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যারাক থেকেই আমাদের পুলিশ সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আঘাত হেনেছিল। ... রাত চারটায় পাকিস্তানি সেনারা ট্যাংকের বহরসহ পুলিশ লাইন্স এ প্রবেশ করে এবং পৈশাচিক আনন্দে নারকীয় তান্ডবলীলার মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ চলাতে থাকে। ... রাত সাড়ে চারটার পর আমরা দিশেহারা হয়ে যে যার মতো আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ লাইন্স থেকে বেরিয়ে পড়ি।

ঢাকা শহরে নিরীহ জনতার উপর পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণের খবর রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে পুলিশ বেতারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলাদেশে। পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণ রুখে দিতে দেশব্যাপী পুলিশ লাইন্সগুলোতে নেয়া হয়েছিল সর্বাত্মক প্রস্তুতি। শুধু রাজারবাগ পুলিশ লাইন নয় পাকিস্তানি সেনারা সেদিন ঢাকার সব ক'টি থানায়ও আক্রমণ করে বসে এবং প্রায় সবখানেই পুলিশের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এসব অসম প্রতিরোধ যুদ্ধে পুলিশ সদস্যগণ অকাতরে আত্মবিসর্জন দিয়েছিল। তবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের সতর্ক সংকেত পেয়ে সারাদেশের পুলিশ বাহিনী সে রাতে এবং তার পরে পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুমিলা,, পাবনা, কুষ্টিয়াসহ দেশের অনেক পুলিশ লাইন্সে ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিল পাকিস্তানি সেনারা। রাজশাহীর ডিআইজি মামুন মাহমুদ এবং এস.পি-কে পাকিস্তানি সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে। ঢাকা শহরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স এবং বিভিন্ন থানাসহ সারা দেশের অসংখ্য পুলিশকে এভাবে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকদের হাতে কতজন পুলিশ মারা গিয়েছিল তা' অনুমান করা যায় লাশ সরানোর কাজে নিয়োজিত ঢাকা পৌরসভার সুইপার ইন্সপেক্টর সাহেব আলীর জবানবন্দি থেকে– "পৌরসভার কনজারভেন্সি অফিসার ইদ্রিস মিয়া আমাকে ডোম নিয়ে অবিলম্বে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা লাশ সরিয়ে ফেলতে বলেন। আমার দল আমার সাথে যে সব লাশ তুলেছে তার বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারি, পুলিশ, আনসার ও পাওয়ারম্যানদের খাঁকি পোশাক পরা বিকৃত লাশ। ২৬ মার্চই আমি বাবুবাজার পুলিশ ফাঁড়ির কাছে ১০ জন পুলিশের পোশাক পরা ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত লাশ দেখতে পাই।

২৫ মার্চ রাত ১১টা থেকে ২৭ মার্চ ভোরবেলা– পুরো দুটো রাত একটা দিন। এর মধ্যে একটি মূহুর্তের জন্যও ছন্দপতন ঘটেনি পাকিস্তানি সৈন্যদের তান্ডবের। ঢাকা শহর ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল তারা তাদের মারণাস্ত্রের গোলার বৃষ্টিতে। 'মাতাল রাজা নীরো আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিল রোম নগরী। প্রাসাদের ছাদে উঠে শহরটাকে জ্বলন্ত দেখে সে কি উলাস তার! রোমের নগর-জনপদ থেকে বাতাসে ভেসে এসেছিল আগুনে পোড়া মানুষের যন্ত্রণা-কাতরধ্বনি আর শিশুর আর্তনাদ। শংকিতা নারীর বোবা কান্না। বিপন্ন রোমবাসীর মরণ যন্ত্রণায় খলখলিয়ে হেসেছিল নীরো। নরক গুলজার করে বাজিয়েছিল বাঁশি। প্রাচ্যের আর এক নীরো রাওয়ালপিন্ডির মাতাল ইয়াহিয়া-টিক্কা। ... গভীর রাতে রোম শহরে আগুন দিয়েছিল নীরো। ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীও রাতের আঁধারে নামলো রাজধানী ঢাকায়। গোলা দিয়ে ঝাঁঝরা করল শহর। আগুন দিয়ে পুড়ল। অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের রক্তে লাল করল রাজপথ...।

২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যগণ এবং ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যগণ পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে হতবিহ্বল হয়নি, ভেঙে পড়েনি। হৃদয়ে ধারণ করা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা এবং স্বাধীনতার চেতনা তাঁদেরকে সাহস যুগিয়েছে। সূচিত হয়েছে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের। তাঁদের এই আত্মত্যাগ শুধু পুলিশের অহংকার নয়, এ অহংকার সমগ্র বাঙালি জাতির এবং বাংলাদেশের।

অবসরপ্রাপ্ত ট্রেজারার–
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

আরপিএমপি'র কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত...

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান...

আরপিএমপি'র কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত...

পুলিশ কমিশনার মহোদয় 'বিপিএম' পদক গ্রহণ করছেন

আইজিপি মহোদয়ের সালামী গ্রহণ

আরপিএমপি পরিদর্শন করছেন আইজিপি মহোদয়

আইজিপি মহোদয় কর্তৃক ওয়েবসাইট ও কর্মবন্টন নির্দেশিকার উদ্বোধন

পুলিশে শুদ্ধাচার

ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ্ •

একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য কৌশল হিসেবে শুদ্ধাচারের প্রতিষ্ঠা বাঞ্চনীয়। শুদ্ধাচার হলো নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ এবং কোন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য। শুদ্ধাচার কার্যক্রমকে বাংলাদেশ সরকার বিশেষভাবে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হচ্ছে কর্তব্য, নিষ্ঠা ও সততা বাংলাদেশের সংবিধানে "মানব সত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ" রাষ্ট্র-পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যে নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশের প্রধান আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকারী এই সংস্থার কার্যকারিতার উপর দেশের স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল। তাই পেশাগত জীবনে এই বাহিনীতে শুদ্ধাচারের অনুশীলন অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশ পুলিশে শুদ্ধাচার অনুশীলনে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

(১) বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা : যেকোন বাহিনীর কার্যকারিতা সেই বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার উপর নির্ভরশীল। তাই সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব এবং আইনানুগ পদ্ধতিতে পুলিশ বাহিনীর চেইন অব কমান্ড সুনিশ্চিত করতে হবে।

(২) সেবার মনোভাব গঠন : পুলিশ বাহিনীকে একটি প্রকৃত সেবাদানকারী সংস্থায় রূপান্তরিত করতে হলে "পুলিশ জনগণের বন্ধু" এই শ্লোগানকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। কোন নিরপরাধ মানুষ যেন সেবা নিতে এসে অহেতুক হয়রানির স্বীকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সেবার মনোভাব নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্বে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

(৩) পেশাদারিত্ব : পেশাদারিত্ব বলতে বোঝায় দায়িত্ব নেয়ার ক্ষমতা, কাজ করার উদ্যমতা, কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্মদক্ষতা। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে পেশাদারিত্বের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি দূর করে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভাল কাজ করার মনোভাব গড়ে ওঠে।

(৪) শাস্তির ব্যবস্থা : বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যান্য বকশিস বা অনৈতিক আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কেউ করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) বাহিনীর সদস্যদের আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল : নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বছর শেষে বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) আধুনিকায়ন : বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে ঢেলে সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পুলিশ বাহিনীকে পরিচিত করাতে হবে।

(৭) আইনের পরিবর্তন : যে সকল ঔপনিবেশিক আইন পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্কের অন্তরায় তা পরিবর্তন করতে হবে। আইন এমন হতে হবে যেন পুলিশ ও জনগণের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(৮) রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে পুলিশ বাহিনীর অপব্যবহার রোধ : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অন্যতম একটি সমস্যা হলো রাষ্ট্রীয় বাহিনীসমূহ বিভিন্নভাবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয়। তাই প্রকৃত পক্ষেই শুদ্ধাচারী বাহিনী হিসেবে পুলিশকে গড়ে তুলতে হলে পুলিশের উপর রাজনৈতিক প্রভাব দূর করতে হবে।

(৯) উপযুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি : পুলিশ বাহিনীর জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হবে। উপযুক্ত বেতন-ভাতা, বাসস্থান, খাবার, স্বাস্থ্য-সেবা, ভাল কাজের স্বীকৃতি, চাকুরি শেষে মানানসই পেনশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) নৈতিকতা কমিটি গঠন : নৈতিকতা কমিটি গঠন করতে হবে এবং তার কর্মপরিধি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে। সরকার ও নৈতিকতা কমিটিকর্তৃক অর্পিত দায়িত্বের প্রতি কর্মীদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

(১১) শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং সময়মত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে।

(১২) পুলিশের প্রশিক্ষণ : পুলিশের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে।

(১৩) নিয়োগের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ : পুলিশের নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, ঘুষ বাণিজ্য, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি মেধাবীদের এই পেশায় আগ্রহ সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। কোনরকম অনিয়মে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(১৪) পুলিশভীতি দূরীকরণ : বর্তমানে মানুষের মনে পুলিশ বাহিনীর ব্যাপারে ভীতি কাজ করে। এই ভীতি পুলিশ ও জনগণের মাঝে দূরত্ব তৈরী করে রেখেছে। পুলিশ বাহিনীকে এই ভীতি দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(১৫) ইতিবাচক প্রচারণা : পুলিশের অনেক ইতিবাচক কাজ সঠিক প্রচারণার অভাবে মানুষ জানতে পারেনা। পুলিশের ইমেজকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইতিবাচক প্রচারণার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে পুলিশ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি সরকারের অঙ্গীকার থাকে দেশের সুশাসন নিশ্চিত করা। সুশাসন নিশ্চিত করতে পুলিশের শুদ্ধাচার অপরিহার্য। শুদ্ধাচার ছাড়া দুর্নীতিমুক্ত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য পুলিশকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে শুদ্ধাচারে দীক্ষিত হয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করতে হবে।

উপাচার্য
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আমাদের পুলিশ বাহিনী

মুহম্মদ জাফর ইকবাল •

আমার বাবা একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। মোটামুটি ছোট থাকতেই আমি টের পেয়েছিলাম সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশের পরিচয়টা খুব ইতিবাচক না। তখন কারণটা বুঝতে পারিনি, এখন পারি। ব্রিটিশ আমলে পুলিশ ব্রিটিশ রাজ্যের জন্য কাজ করেছে, বইপত্রে "লাল পাগড়ী" নিয়ে নানা রকম ভীতিকর গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেখান থেকে আমরা অনুমান করতে পারি তারা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যেতে পারেনি। সাতচল্লিশ সালে যখন দেশ ভাগ হল তখন পুলিশটা হল পাকিস্তান সরকারের পুলিশ। সেই সময়ে দেশের পুরো ইতিহাসটাই হল আন্দোলনের ইতিহাস। দেশের মানুষ যখন ভাষা আন্দোলন করেছে, ছয় দফার আন্দোলন করেছে, ঊনসত্তুরের গণ আন্দোলন করেছে পাকিস্তান সরকার তখন তাদের ঠেকিয়ে রাখার জন্যে দমন নির্যাতন নিপীড়ন করেছে। সেই কাজে ব্যবহার করেছে কাকে? পুলিশকে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার জন্যে সাধারণ একজন পুলিশ সদস্যের যতই সমর্থন থাকুক তিনি কিন্তু একবারও সেটা মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারেন নি। কাজেই দেশের সাধারণ মানুষ ধরেই নিয়েছে পুলিশ মানেই হচ্ছে প্রতিপক্ষ।

একাত্তরে প্রথমবার পুলিশ সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল। পঁচিশে মার্চ যখন পাকিস্তান মিলিটারী ঢাকা শহরে গণহত্যা শুরু করে তখন প্রথম আক্রমন করেছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন আর পিলখানা। পুলিশদের চোর ডাকাত ধরার জন্যে অস্ত্রের ব্যবহার শেখানো হয়, যুদ্ধ করার জন্যে অস্ত্রের ব্যবহার শেখানো হয় না। তাদের যুদ্ধের জন্য কোনো ভারী অস্ত্রও নেই। তারপরেও রাজারবাগের পুলিশেরা কিন্তু পাকিস্তান মিলিটারীর সাথে প্রথম যুদ্ধটা শুরু করেছিল। আমরা তখন ছিলাম পিরোজপুর, আমার বাবা ছিলেন সেখানকার এস.ডি.পি.ও। গভীর রাতে মাইকে পঁচিশে মার্চের মিলিটারী একশানের খবর শুনে আমরা সবাই জেগে উঠেছিলাম। বাবার সাথে আমরা থানায় ছুটে গিয়েছিলাম। পুলিশের নিজস্ব ওয়ারল্যাসে তখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কোনো একজন পুলিশ সদস্যের মুখ থেকে সেই যুদ্ধের বর্ণনা শুনেছিলাম। পিছনে গোলাগুলি মেশিনগানের শব্দ, সেখানে কাঁপা গলায় একজন কথা বলছেন, এতদিন পরও আমার স্মৃতিতে সেটা স্পষ্ট হয়ে আছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের পুলিশ বাহিনী প্রথমবার সুযোগ পেয়েছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়ানোর। আর আন্দোলন থাকবে না, জ্বালাও পোড়াও থাকবে না, সবাই মিলে নিজের দেশের জন্য কাজ করবে। পুলিশ চোর ডাকাত অপরাধীদের ধরে ধরে সবাইকে ঠিক ভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেবে।

কিন্তু ঠিক কী কারণ জানা নেই ব্যাপারটা এখনো সেরকম হয় নি। পুলিশ বাহিনী এখনো দেশের মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না। যখন যে রাজনৈতিক দল দেশ পরিচালনা করে তখন সেই দল পুলিশকে ব্যবহার করে। ঘাঘু অপরাধী উপর থেকে টেলিফোন করিয়ে ছাড়া পেয়ে যায়। বিশাল বিশাল অপরাধ করার পরও পুলিশ তাদের ধরতে পারে না। আমাদের দেশের পুলিশদের অসাধ্য কিছু নেই। তারা যে কোনো অপরাধীকে খুঁজে বের করে ফেলে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই কোনো কোনো অপরাধী ধরা পড়ে না, শুধুমাত্র একটি কারণে, তাদের সাথে রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ আছে। তাদেরকে ধরার জন্যে পুলিশ নিশ্চয়ই উপর থেকে 'গ্রিন সিগনাল' পায় না। পুলিশ সেই কথাটা মুখ ফুটে বলতেও পারে না। দেশের মানুষ, পত্রপত্রিকা টেলিভিশনে সবার গালমন্দ তাদের হজম করতে হয়। দেখে আমার মায়াই লাগে।

এমনিতে পুলিশের বাহ্যিক চেহারা বেশ ভাল হয়েছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পুলিশের কেমন জানি একটা দূর্বল দূর্বল ভাব ছিল। আজকালকার পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা শক্ত সমর্থ এবং সুদর্শন, দেখে ভালো লাগে। কিছুদিন আগে গাড়ী করে দক্ষিণ বঙ্গে যাচ্ছি পথে অনেক পুলিশ, তারা হাত তুলে গাড়ী থামাল। গাড়ীতে আমি এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক, তাদের মাঝে আমার স্ত্রীও আছেন। পুলিশ যখন হাত তুলে একটা গাড়ী থামায় তখন সব সময়েই গাড়ীর প্যাসেঞ্জাররা এক ধরনের দুর্ভাবনা অনুভব করে? আমি করি না, গাড়ীর কাগজপত্র ঠিক আছে, আমি কোনো অপরাধ করি না তাহলে কেন দুর্ভাবনা করব। তবে ঠিক কী কারণ জানি না যখন একটা গাড়ী থামানো হয় তখন গাড়ীর ড্রাইভারেরা কেমন যেন অপমানিত বোধ করে।

পুলিশের সদস্য গাড়ীর কাগজপত্র নিয়ে দূরে বসে থাকা কয়েকজন অফিসারের কাছে গিয়েছে এবং হঠাৎ করে একজন অফিসার প্রায় ছুটে গাড়ীর কাছে জানালা দিয়ে মাথা ঢোকালেন, তার উচ্ছসিত আনন্দিত কণ্ঠস্বর, ''স্যার! ম্যাডাম! আপনারা? আমি আপনাদের ছাত্র!''

শিক্ষকতার এই একটা আনন্দ আছে যেটা চিত্র নায়ক থেকে ক্রিকেট প্লেয়ার, মন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি কেউ কখনো পায়নি। সমাজের সব জায়গায় শিক্ষকেরা তাদের ছাত্রছাত্রীদের পেয়ে যায়। আমাদের মুখেও হাসি ফুটে উঠল, সৌজন্যের কথা বলার আগেই আমার ছাত্র আবদার করল, '' স্যার ম্যাডাম নামেন গাড়ী থেকে। চা খেয়ে যান।''

তাড়াহুড়া আছে সময় নেই ইত্যাদি যুক্তি ছাত্রদের সাথে কাজে লাগে না, কাজেই আমাদের নামতে হল এবং পুলিশ বাহিনী তাদের কাজকর্ম ফেলে আমাদের ঘিরে দাড়ালো। তখন আমি একটা মজার দৃশ্য দেখতে পেলাম, রাস্তা দিয়ে হুস হাস করে গাড়ী যেতে যেতে গাড়ীগুলো তাদের গতি কমিয়ে, গাড়ীর প্যাসেঞ্জাররা জানালা দিয়ে মাথা বের করে আবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্নটি খুব স্পষ্ট, পুলিশ এতগুলো ক্রিমিনালকে ধরে ঘিরে রেখেছে, এরা কারা? জঙ্গী? চোরাচালানীর দল? না কি নারী ও শিশু অপহরণকারী ?

সেইবারই আবার যখন ফিরে আসি আশুলিয়ার কাছাকাছি পুলিশ আবার আমাদের থামাল। যারা সেখানে আছে তাদের মাঝে আমার কোনো ছাত্র নেই, সেই কারনেই কী না জানি না রুটিন চেক হঠাৎ করে কেমন জানি বিগড়ে গেল। পুলিশের লোকজন আমাদের গাড়ী থেকে নামিয়েছে এবং একজন আমার কম বয়সী সহকর্মীর দিকে এগিয়ে এসেছে তার বডি সার্চ করার জন্যে। আমার স্ত্রী কাছেই ছিল, সে একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়ল, ''কী? আপনাদের এতো বড় সাহস? ইনি বলছেন ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তারপরেও তার বডি সার্চ করে দেখতে হবে? ঠিক আছে, আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমাকে দিয়ে শুরু করেন, আসেন।''

দ্রুত সেখানে বিশাল হট্টগোল শুরু হল এবং তাড়াতাড়ি কাছাকাছি কোনো এলাকা থেকে একজন অফিসার চলে এসে কোনোমতে অবস্থাটা রক্ষা করলেন। ঘটনাটি হয়তো ছেলে মানুষী এবং হাস্যকর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশদের হয়তো অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয় কিন্তু তাদের সব সময়েই সেটি করতে হবে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে। একজন অপরাধীর হাতে হ্যান্ডকাফ লাগাতে হলেও সেটি করতে হবে সম্মানবোধ বজায় রেখে। একটা গাড়ী থামিয়ে একজন পুলিশ সদস্য যদি বলে, ''কেমন আছেন ভাই আপনি? আমাদের একটা রুটিন ডিউটি করতে হচ্ছে কিছু মনে করবেন না। একটু কাগজপত্রগুলো দেন, দেখে দিয়ে দেব। এক মিনিটও লাগবে না।'' আমার ধারণা ড্রাইভারেরা তাহলে অপমানিত বোধ করবে না, আনন্দের সাথে কাগজপত্র দেখাবে। কাগজপত্র দেখে পুলিশের সদস্য যদি বলে, ''থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডিস্টার্ব করলাম কিছু মনে করবেন না। সাবধানে গাড়ী চালাবেন।'' তাহলে পুরো ব্যাপারটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। পৃথিবীর অনেক দেশেই পুলিশকে সাধারণ মানুষ নিজের মানুষ বলে মনে করে। আগে হোক পরে হোক আমাদের দেশেও নিশ্চয়ই এটা হবে। আমরা চাই সেটা পরে না হয়ে আগেই হোক। অনেক আগে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমার বাবার সাথে সাথে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় থেকেছি। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, পঞ্চগড়, জগদ্দল, সিলেট, বগুড়া, কুমিল্লা, পিরোজপুর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ছিলাম না। ভারী মজার একটা শৈশব ছিল আমাদের, যখন ছোট ছিলাম তখন টের পাইনি। বড় হয়ে আবিস্কার করেছি আমাদের খুব টানাটানির সংসার ছিল। বেতনের হাতে গোনা এত অল্প টাকা দিয়ে আমার মা কীভাবে সংসার চালাতেন সেটা এখনো

আমার কাছে রহস্যের মতো মনে হয়।

এতদিনেও ব্যাপারটার পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। আমরা যদি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে তুলনা করি তাহলে দেখব পুলিশ বাহিনীর বেতন সুযোগ সুবিধা কিছুই নেই। সেনাবাহিনীর হোটেল রেডিসন আছে, ট্রাস্ট ব্যাংক আছে, তাদের অফিসারদের জন্য হাউজিং সোসাইটি আছে, রূপগঞ্জ আছে, চকচকে পোষাক আছে, ক্যাডেট কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, মেডিক্যাল কলেজ সবই আছে তাহলে পুলিশের কিছু নেই কেন ? সশস্ত্র বাহিনী যেরকম দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব পালন করে আমাদের পুলিশ বাহিনীও তো সে রকম কিংবা তার থেকেও বড় একটা দায়িত্ব পালন করে। তাহলে সরকার তাদের এভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে কেন ? সে রকম সুযোগ সুবিধে নেই, বেতন অল্প অথচ দেশের সবচেয়ে বড় দায়িত্বটাই তাদের পালন করতে হয়। এই বৈষম্যটা কি সবার চোখে পড়ে না ? আমাদের বাংলাদেশ আজ থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগের বাংলাদেশ নয়, দেখতে দেখতে এটা একটা অর্থনৈতিক শক্তিতে পাল্টে যাচেছ (প্রতি তিন দিনে বাংলাদেশ এক বিলিয়ন ডলার তৈরী করে)। তাহলে আমরা কেন এখন ঠিক জায়গায় অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করব ? দেশের শিক্ষা ব্যবস্হা ঠিক করতে হলে যে রকম সবার আগে প্রাইমারী শিক্ষা ঠিক করতে হয়, ঠিক সে রকম দেশের আইন ও শৃংখলা ঠিক করে দেশকে সভ্য দেশ করতে হলে সবার আগে পুলিশ বাহিনীকে ঠিক করতে হবে। সেটা করা সম্ভব পুলিশ বাহিনীতে উৎসাহী তরুণ তরুণী এনে, আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে এবং সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করে।

আমার পুলিশ অফিসার বাবা তার দায়িত্ব পালন করার সময় উনিশ'শ একাত্তর সালে পাকিস্তান মিলিটারীর হাতে মারা যান। পাকিস্তান মিলিটারী নদীর তীরে দাড়া করিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করে তার দেহটি নদীতে ফেলে দিয়েছিল। তিন দিন পর গ্রামের মানুষ তার দেহটিকে নদী থেকে তুলে গভীর মমতায় নদী তীরে কবর দিয়েছিল। একজন পুলিশ অফিসার হলেও তিনি এলাকার মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিলেন। আমি স্বপ্ন দেখি আমাদের পুলিশ বাহিনীও হবে আমার বাবার মত, দেশের সাধারণ মানুষের এই বাহিনীর সকল সদস্যের জন্য থাকবে গভীর ভালবাসা। যখন কোন একজন সাধারণ মানুষের কাছে একজন পুলিশ এসে দাড়াবে, সেই সাধারণ মানুষটির মুখে তখন নিরাপত্তার একটা কোমল হাসি ফুটে উঠবে।

পৃথিবীর অন্য দেশ যখন এটা পেরেছে, আমরা কেন পারব না ?

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
লেখক, শিক্ষাবিদ

আলোকচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের অংশবিশেষ

সিসিটিভি উদ্বোধন করছেন আইজিপি মহোদয়

সিটিজেন চার্টার উদ্বোধন

বেতার কন্ট্রোলরুম

বাংলাদেশ পুলিশ এর শপথনামা প্রদর্শন

আলোকচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের অংশবিশেষ

নিরাপদ সড়ক দিবসের র‍্যালি

পুলিশ সেবা সপ্তাহের শোভাযাত্রা

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, আরপিএমপি

আরপিএমপি'র কর্মবন্টন নির্দেশিকা

পিতা, তোমার মহিমায় তুমি যে মহীয়ান !

পাভেল রহমান ●

১৯৬৬ সালে যশোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের ঐ ঘটনাটি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল এবং এক সময় স্থায়ী বাসা বাঁধে আমার ছোট্ট শিশু মনে। কর্ম ব্যস্ত বাবাকে কাছে পেলেই আমি শেখ মুজিবের কথা শুনতে চাইতাম। পত্রিকার পাতায় আমি শেখ মুজিবের ছবি খুঁজতাম। বাবার মুখেই শেখ মুজিবর রহমানের দেশপ্রেম আর মানুষকে ভালোবাসার গল্প শুনে শুনে আমি বড় হতে থাকি। উনসত্তর সত্তর পেরিয়ে একাত্তরের ২৩শে মার্চ জীবনে প্রথম তাঁর দর্শন পেয়ে যাই ধানমন্ডির ৩২ নাম্বারে। আমি তখন ঢাকায় সিদ্বেশ্বরী হাই স্কুলের ছাত্র।

বঙ্গবন্ধু আমাদের প্রস্তুত থাকতে বললেন। 'তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'। আমরা তৈরি হলাম। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতির লক্ষ্যে 'জয় বাংলা' বাহিনী গঠন করলো। আমি 'জয় বাংলায়' নাম লিখলাম। পলাশী মোড় সংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির শেরে-বাংলা হলের মাঠে আমরা প্রায় শ' তিনেক কিশোর যুবক গেরিলা যুদ্ধের 'হিট এন্ড রান' এর কৌশল, শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সেই অস্ত্র দিয়েই শত্রুকে ঘায়েল করার প্রশিক্ষণ নিতে থাকি। প্রশিক্ষণ নিতে থাকি ব্যারিকেডের ফাঁদে ফেলে শত্রুর উপর মলটভ ককটেল চার্জ করার। প্রশিক্ষণ শেষে একাত্তরের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে পল্টন ময়দানে 'জয় বাংলা' বাহিনী স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেই ছুটে এসেছিলাম বঙ্গবন্ধুকে সালাম জানাতে। পল্টন থেকে ধানমন্ডি ৩২ নাম্বার, রাজপথে হাজারো উৎফুল জনতা আমাদের করতালি, হর্ষ ধ্বনিতে শ্লোগানে অভিনন্দিত করলেন। আমাদের কমান্ডার আইজ রাইট বলে যখন উচ্চস্বরে নির্দেশ দিলেন, 'জয় বাংলা' বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে সালাম জানাবে, সালাম জানা। মার্চ করতে করতে আমরা ডানদিকে বুক টান করতেই দেখি বাড়ীর লোহার গেটে দাঁড়িয়ে সালামের প্রতি উত্তর দিচ্ছেন সাদা পাঞ্জাবী পরিহিত মোটা কালো ফ্রেমের চশমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। উপস্থিত হাজারো জনতাগণ বিদারী জয় বাংলা ধ্বনিতে, করতালিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। সেই আমার প্রথম বঙ্গবন্ধু দর্শন।

গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরা প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৫ সালের জুলাই। আততায়ীর হাতে সপরিবারে নিহত হবার মাত্র ক' দিন আগের এক সন্ধ্যার কথা বলি। শেষ বিকেলে গোধূলির রঙ্গে রঙ্গিন ছিল প্রকৃতি। নারিকেল পাতায় অপূর্ব সবুজের মাঝে সাঁঝের মায়া ছুঁয়ে ৩২সের আকাশ। তিনতালার প্রশস্ত খোলা ছাঁদে বঙ্গবন্ধুকে বসে থাকতে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। শুভ্র সাদা গেঞ্জিতে ঠোটের কোণে বিখ্যাত সেই পাইপ। পাইপের মিষ্টি এরিনমোর পরিবেশকে আরও স্নিগ্ধ করে তুলেছে। বঙ্গবন্ধুকে অপূর্ব এই ভঙ্গিমায় বসে থাকতে দেখে আমি ব্যাগ থেকে বের করে আনি ক্যামেরা। ফ্ল্যাশ লাইট লাগিয়ে ফেলি দ্রুত। তাঁর বসার মাঝে ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর বাঙ্গালিয়ানার দারুন একটি রূপ! আমি এই ছবিটি তোলার জন্য অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু এমন একান্তে বসা অবস্থায় কি ছবি তোলা উচিৎ ? অনুমতি নিতে গেলে যে তাঁর এমন কম্পোজিসন আর পাবো না! তাঁর চেয়ে না জানিয়ে ছবি তুলে ফেলি। যদি বঙ্গবন্ধু রাগ করেন? ক্যামেরা তুলে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রাখি। বাবার মিনোলটা হাইমেটিক সেভেন ক্যামেরায় ৪৯ মিলিমিটার ওয়াইড ফিক্স ফোকাস লেন্সে আমি ফ্রেম করে ফেলি বঙ্গবন্ধুকে। সন্ধ্যার নিভু নিভু আলোতে ক্যামেরা থেকে সাবজেক্টে বঙ্গবন্ধুর দূরত্ব মিলে যায় ফোকাস, ব্যাস সাথে সাথে ক্লিক! ফ্ল্যাশের আলোয় বঙ্গবন্ধুর সাদা গেঞ্জি যেন আরও সাদা হয়ে ওঠে, আলোর বন্যায় ভেসে যায় ছাদের অন্ধকার। চমকে ঘুরে তাকান বঙ্গবন্ধু আমার দিকে। কিন্তু তিনি আমাকে বুঝতে পারেন না। সম্ভবত অন্ধকারে ফ্ল্যাশের আলোয় ঝাপসা হয়ে উঠেছিল তাঁর দৃষ্টি! আমাকে অস্পষ্ট দেখে অপ্রস্তুত বঙ্গবন্ধু বলে উঠেন, 'কে রে? কে রে? তুই আমার ছবি তুললি'? তাঁর ভরাট আর গুরু গম্ভীর সেই কণ্ঠস্বর শুনে আমি ভয় পেয়ে যাই। ভয়ে একেবারে গুটিশুটি। বঙ্গবন্ধু এতো রাগ করলেন? ছবিটা তুলে কি আমি ভুল করলাম। ভীত আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে

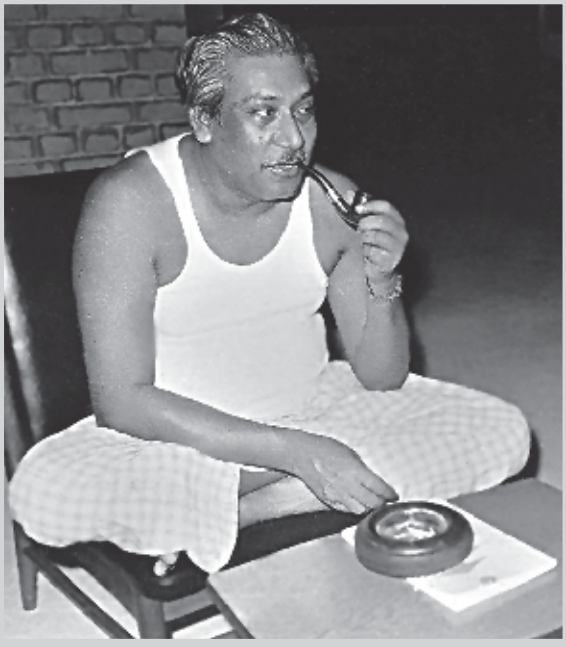

থাকি হতবিহ্বল। ভয়ে বঙ্গবন্ধুর দিকে আমি তাকাতেই পারিনা। মাথা নিচু করে পায়ের নক খুঁটি কংক্রিটের ছাঁদে। বঙ্গবন্ধুর সামনে বসা হারুন ভাই ততক্ষণে তাঁকে সামাল দিতে চেষ্টা করছেন। 'বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু, পাভেল আমাদের পাভেল আপনার ছবি তুলেছে'। হারুন ভাইয়ের কথায় বঙ্গবন্ধু এবার ফিরে তাকান আমার দিকে। আমার নাম শুনে নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর রাগটাও নেমে আসবে। কিন্তু তিনি যেন আগের চেয়ে ও বেশী রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। আমার নাম শুনে উল্টো আমাকেই প্রশ্ন করে বসলেন, 'তুই চিনিস আমি কে'? এবার আমি স্তম্ভিত। এ কি বললেন তিনি? তিনি তো আমাকে চেনেন। আমি ভাবলাম না বঙ্গবন্ধুকে তো এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতেই হবে। আমি মাথা তুলে তাকাই তাঁর দিকে। চোখে চোখ রাখি বঙ্গবন্ধুর চোখে। অনেকটা তাঁর মতো উচু কণ্ঠেই বলে উঠি, হ্যাঁ, চিনি, আপনি বঙ্গবন্ধু! বঙ্গবন্ধু যেন তৈরি ছিলেন। বললেন, 'আমি কি শুধু বঙ্গবন্ধু? আমি দেশের প্রেসিডেন্ট! আর প্রেসিডেন্ট কি লুঙ্গি গেঞ্জি পরে ছবি তোলে'? তাঁর কথায় আমি ভড়কে যাই। আমি ভাবতে থাকি বঙ্গবন্ধু তো বঙ্গবন্ধুই। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট কি পরেই বা ছবি তোলে? স্যুট টাই? মনে মনে যখন এমন ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে তখন বলার মত কিছুই খুঁজে পাইনা। তাঁর সেই ভরাট, তেজস্বী কণ্ঠ আমাকে আরও ভীত করে ফেলে। আমি কোন উত্তর দিতে পারি না । আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বলে উঠলেন 'তোমার পানিশমেন্ট হবে'! বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে 'পানিশমেন্ট' উচ্চারিত হতেই আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরে প্রেসিডেন্টের এই ছবি তোলার জন্য আমার পানিশমেন্ট হবে? আমার মাথা ঘুরতে শুরু করে। আমি ঘামতে থাকি। আমার গলা শুকিয়ে আসে। হৃদস্পন্দন উঠা নামা করে। আমি ভাবতে থাকি তাহলে কি বাবার ক্যামেরাটা কেউ কেড়ে নিবে? ফিল্মটা কি টেনে হিঁচড়ে খুলে ফেলবে? নাকি আমাকেই ধরে নিয়ে যাবে? আমি আড় চোখে চুপি চুপি লুকিয়ে দেখি বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধুকে আমার অচেনা লাগে। তিনি তো এমন নন। বঙ্গবন্ধু এবার এ ডি সি ক্যাপ্টেন শরীফ আজিজকে, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, তলব করলেন, 'শরীফ শরীফ', ডেকে উঠলেন। আমার বুঝতে বাকী রইলো না এখুনি আমার পানিশমেন্টের হুকুম জারি করবেন বঙ্গবন্ধু। কি যে 'পানিশমেন্ট' দিবেন তিনি? আমার মন তোলপাড়। আমি এতোটাই ভীত হয়ে যাই যে সাহায্যের আশায় খুঁজে ফিরি বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ভাইকে। একমাত্র তিনি আমাকে বাঁচাতে পারেন।

এসব ভাবনায় আমি যখন হিমশিম খাচ্ছি তখন আমাকে বিস্মিত করে বঙ্গবন্ধু তাঁর সার্ট চাইলেন শরীফ আজিজের কাছে। বললেন, 'শরীফ আমার সার্টটা নিয়ে আয়তো'। বঙ্গবন্ধু সার্টটা পরতে পরতে তাকালেন আমার দিকে। আমার সাথে চোখাচোখি হয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর। আমি তখন আতংকে 'পানিশমেন্টের' কথাই ভাবছি তাকিয়ে! তিনি বলতে শুরু করলেন, 'তোমার পানিশমেন্ট হচ্ছে আমি সার্ট পরবো তুমি আরেকটা ছবি তুলবে'! তাঁর কথা শেষ হতেই আমি হেসে ফেলি। বঙ্গবন্ধুর কথায় আমার তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। বঙ্গবন্ধুর মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠে! আমি তো এই বঙ্গবন্ধুরই ছবি তুলেছিলাম, আমি তো এই বঙ্গবন্ধুকেই এতক্ষণ খুঁজে ফিরছিলাম! মুহূর্তে মেঘ মুক্ত আকাশে চাঁদ হেসে উঠে। আমি তাকিয়ে দেখি সাঁঝ আকাশের তাঁরারা সব ছুটে আসছে বঙ্গবন্ধুর দিকে। আর আমি ছুটে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরেছি! এই না হলে আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান!

পিতা তোমার মহিমায় তুমি যে মহীয়ান !

শুদ্ধাচার ও উত্তম চর্চা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ পুলিশ

মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান •

শুদ্ধাচার (Integrity) ঃ শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরী। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সমাজ বিভিন্ন খাত, যথা-রাষ্ট্র, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজে বিভিন্ন আইনকানুন, নিয়মনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন ও লালন করে শুদ্ধাচার অনুশীলন করে চলেছে এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করছে।

বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই জাতির লক্ষ্য 'রূপকল্প ২০২১' -এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র থাকবে না। দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা' হবে, 'যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত' হবে। সরকার বিশ্বাস করে যে, এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য-কর্তব্য এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল। ঐতিহ্যগতভাবে লব্ধ এবং বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রণীত আইনকানুন, বিধিবিধান ও পদ্ধতি সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়। এই লক্ষ্যেকে সামনে রেখেই ২০১২ সালে একটি কৌশল-দলিল হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায় ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ, এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তি মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও বিধিবিধান প্রনীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৭২ সালে ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গৃহীত আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতিপয় মূলনীতি নির্ধারিত হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের প্রত্যয় হল ঃ-

১. মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করণ (১০ অনুচ্ছেদ)।
২. মৌলিক মানবাধিকার স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ)।
৩. মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ)।
৪. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ)।

৫. নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন ও সুষম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করণ। (১৯ অনুচ্ছেদ)
৬. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ)।
৭. প্রত্যেকের যোগ্যতা বিবেচনা করে কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিতকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)।
৮. কোন ব্যক্তিকে অনুপার্জিত আয় ভোগ থেকে অসমর্থককরণ (২০ অনুচ্ছেদ)।

এই সূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা নিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের একটি মূল নীতি।

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা ঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের দুর্নীতি নির্মূল ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সমাজ তা প্রতিপালন করে; সেই সঙ্গে সমাজের নীতিচেতনা ও মূল্যবোধও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। এই সম্পর্কের জটিলজালে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতা ও শুদ্ধতার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার যুক্তরূপ প্রতিষ্ঠানগত শুদ্ধাচার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাও জরুরি। এই কৌশলটির চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যক্তি মানুষের শুদ্ধাচার, অন্য কথায় চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা; কিন্তু এর হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র, বেসরকারী ব্যবসাখাত ও সুশীল সমাজের যে সব প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রতীয়মান হয়, তাদের উন্নয়ন বিবেচনা করা হয়েছে; শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতি উন্নয়ন সাধান, ক্ষেত্রবিশেষে আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন এবং নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তন, লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-২০১২ এর রূপকল্প 'সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। এক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করেছেন। শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য একজন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিম্নেবর্ণিত সূচকের সাহায্যে ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়।

ক্রমিক নং	সূচক সমূহ	নম্বর
১.	পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা	৫
২.	সততার নিদর্শন	৫
৩.	নির্ভরযোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা	৫
৪.	শৃঙ্খলাবোধ	৫
৫.	সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণ	৫
৬.	সেবা গ্রহীতার সঙ্গে আচরণ	৫
৭.	প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৫
৮.	সমন্বয় ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা	৫
৯.	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শীতা	৫
১০.	পেশাগত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক নিরাপত্তা সচেতনতা	৫
১১.	ছুটি গ্রহণের প্রবনতা	৫
১২.	উদ্ভাবন চর্চা	৫
১৩.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপরতা	৫
১৪.	সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার	৫
১৫.	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে আগ্রহ	৫
১৬.	উপস্থাপন দক্ষতা	৫
১৭.	ই-ফাইল ব্যবহারে আগ্রহ	৫
১৮.	অভিযোগ প্রতিকারে সহযোগিতা	৫
১৯.	মন্ত্রনালয়/বিভাগ/ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/ দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য কার্যক্রম	১০
	মোট	১০০

উত্তম চর্চা (Best Practices) ঃ সরকারের উন্নয়নের অভিষ্ঠ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দরকার একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা যা সুশাসন নামে পরিচিত। সুশাসন একটি রাষ্ট্র সমাজকে কাঙ্খিত উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছে দেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী কর্মচারীদের আচরণে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে সরকারী সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকারী কর্মচারীদের কাজের স্বচ্ছতা, জবাব-দিহিতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন যা উত্তম চর্চার মাধ্যমে সম্ভব। উত্তম চর্চা (Best Practices) হল একটি পদ্ধতি বা কৌশল যা অন্যান্য সকল বিকল্পের মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং আইনগত ও নৈতিকভাবে মানসম্মত।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের প্রধান আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিনিয়ত জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানসহ নানা ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। কোন বিশেষ পরিস্থিতির শিকার বা জরুরী প্রয়োজনে জনসাধারণ পুলিশের সেবা প্রত্যাশী হন। তাই পুলিশের তাৎক্ষণিক সাড়া বা প্রত্যাশিত সেবা প্রদান জনমনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ কারণে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় পুলিশকে সরকারের উন্নত "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়" বাস্তবায়নে গণমূখী সেবা প্রদানে নতুন নতুন উদ্ভাবনী কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে উত্তম চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।

উত্তম চর্চার অভিজ্ঞতা বিনিময় ঃ পুলিশের কোন কর্মকর্তা বা কোন ইউনিট কর্তৃক অপরাধ দমন, অপরাধ তদন্ত, আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ, পুলিশ অভিযান বা পুলিশ সেবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন অভিনব, উদ্ভাবনী বা আধুনিক, প্রযুক্তিগত পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করে যদি সংশ্লিষ্ট কাজে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও উন্নত ফলাফল পাওয়া যায় তবে সে সকল কাজের বিবরণ বা অভিজ্ঞতা উত্তম চর্চার (Best Practices) দৃষ্টান্ত হিসেবে পুলিশের অন্যান্য ইউনিট এ প্রচার ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এভাবে উত্তম চর্চার বিষয়গুলো পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে সকলের নিকট ছড়িয়ে দেয়া গেলে পুলিশ এর ভাল কাজের সুফল সকলে পেতে থাকবে এবং সার্বিকভাবে পুলিশ এর প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে।

পুলিশের উত্তম চর্চার ক্ষেত্রসমূহ ঃ পুলিশ এর সকল কার্যক্রম যেমন-আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ তদন্ত, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গী দমন, নাগরিক সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে উত্তম চর্চার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশ এর বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম বা উত্তম চর্চা চলমান রয়েছে তার মধ্যে (১) ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক (২) ৯৯৯ সেবা (৩) ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (৪) অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (৫) মোবাইল এপস্ বা অনলাইন সেবা (৬) বিট পুলিশিং (৭) কমিউনিটি পুলিশিং (৮) পস্ (POS) মেশিনে ট্রাফিক অপরাধ সংক্রান্ত মামলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সকল পুলিশী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তার সুবিবেচনায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য "উত্তম চর্চার" উদ্যোগ নিতে পারেন।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

TOWARDS CHILD FRIENDLY JUSTICE SYSTEM IN BANGLADESH

Every day, in all parts of the world, children come into contact with police either when they are in need of care and protection or in conflict with the law. This contact therefore occurs at times when a vulnerable child is most in need of support and guidance. Police need to ensure that this encounter is always a positive one, where both sides emerge with dignity and respect. UNICEF is supporting countries, where needed, to enhance police capacity to ensure that

1) children in need of care and protection are protected, supported and empowered to make the best of their difficult circumstances, and

2) children in conflict with the law are treated fairly, given the opportunity and guidance to take responsibility for their mistakes, and given a second chance to avoid such mistakes in future so they can develop as responsible adults.

In Bangladesh, UNICEF is working with Ministry of Home Affairs at central level and police at sub-national level promoting child friendly policing starting from establishing “Child Affairs Desk” at all police stations and appointment of “Child Affairs Police Officer” who manages the child affairs desk. UNICEF is also supporting establishing linkages between police and other justice actors and structures including communities for better coordination among law enforcement agencies, judiciary and the communities as envisaged in the Bangladesh Children Act 2013 revised 2018.

Diversion which is a contemporary phenomenon in criminal justice in general and juvenile justice in particular is another area UNICEF is working on with police and judiciary. Diversion is considered to be a subject of fundamental human rights and a powerful tool in crime prevention. UNICEF promotes diversion as a strategy in the juvenile justice system to prevent young people from committing offenses or to ensure that they avoid formal court action and custody if they are arrested or prosecuted. Police like other agencies in the criminal justice system have got a fundamental role to play in diverting children from the formal criminal justice system as required by the United Nation’s Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Article 40 of the CRC states that State parties shall seek the establishment of “whatever appropriate and desirable measures for dealing with such children under the age of 18 years without resorting to judicial proceedings" providing that human rights and legal safeguards are fully respected.

UNICEF RANGPUR FIELD OFFICE

অপরাধ সভার কার্যক্রম.....

কল্যাণ সভার কার্যক্রম.....

স্মৃতির শহর রংপুর

আনিসুল হক •

রংপুর আমার স্মৃতির শহর, স্বপ্নের শহর। রংপুর আমাকে মায়ের মতোই ধারণ করেছে, লালন করেছে, পালন করেছে। তারপর একদিন রংপুর ছেড়ে আমি চলে এসেছি ঢাকায়। ঢাকায় থাকি। মাঝে-মধ্যে দেশে-বিদেশে যাই। কত শহর দেখি। তবুও রংপুর থাকে আমার সত্তা জুড়ে।

আমি কবিতায় লিখেছি:

একদিন এ শহর ছেড়ে আমি চলে যাব
কই যাব আর রংপুর ছাড়া
রংপুরে আমার আম্মা থাকেন
যদি আমি চাকরি না করি যদি আমার একটা টাকাও না থাকে
আমাকে আমার আম্মা
বলবেন ভাত খা গোসল করছিস
আমি বলব আজ বৃষ্টি আজ আর গোসল করব না
আম্মা ভাত বেড়ে দেবেন
রান্নাঘর থেকে আঁচলে ভাতের গামলা ঢেকে
তিনি দৌড় ধরবেন আঙিনা পেরুতে
সজনে ডালে টিনের চালে তখন বৃষ্টি বৃষ্টি
বৃষ্টিতে তার শাড়ি ভিজবে
ভাত ভিজবে না ভাপ উঠবে

আমি খাব আর আম্মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন
আমার খাওয়া দেখবেন
আমার মুখ নড়বে
গলা দিয়ে ভাত নামলে সেই ভাত তার পেটেই যাবে
তার পেট ভরে যাবে
বিড়বিড় করবেন: মুছে খা
তোকে যে মোছা খাওয়াতাম মনে আছে
তাই তুই আজ এত বড়

কাঁসার গেলাসে পানি ঢেলে আম্মা হাতে ধরে আছেন
মুখের ভাতটা শেষ হলে যদি আমি পানি চেয়ে বসি

সেই পানি না খেয়েই ফের যদি ঢাকা চলে আসি আমি
আম্মা গ্লাস হাতে দাঁড়িয়েই থাকবেন দাঁড়িয়েই থাকবেন তিনি যেন বায়েজিদ বোস্তামি

আমার শৈশবে রংপুর ছিল একটা শান্ত নিরিবিলি সুন্দর শহর। রাস্তার দুধারে বাড়িগুলোয় ছিল সুরুচি আর নান্দনিকতার ছাপ। ঢেউটিনে ছাওয়া বাড়িগুলোয় ছিল রং, নকশা, আলপনা। সামনে ছিল বাগান। রংপুর শহরের মধ্যেই ধানক্ষেত ছিল। সেই রংপুর অন্য অনেক শহরের মতো বদলে গেছে। বড় বড় ভবন উঠছে। আগে রিকশার পেছনে লণ্ঠন বাঁধা ছিল বাধ্যতামূলক। পুরো শহরে গাড়ি ছিল অতি অল্পসংখ্যক। একদম ছোটবেলায় রিকশার হুডে শাড়ি পেঁচিয়ে নিতে দেখেছি নারী যাত্রীদের।
তবে রংপুর খুবই ঐতিহ্যবাহী শহর। এর ইতিহাস প্রাচীন এবং ঐতিহ্য ঋদ্ধ। এখান থেকে বেরিয়েছে আদিতম সংবাদপত্রের একটি। এখানে এসেছেন বড় বড় কবি-সাহিত্যিক। ভাওয়াইয়া গানের লালনভূমি রংপুর। রংপুরে মঞ্চনাটকের ঐতিহ্য গৌরবময়। মুক্তিযুদ্ধে রংপুরবাসী দিয়েছেন বীরত্বের পরিচয়।
সেই রংপুর এখন মেট্রোপলিটন শহর। মেট্রোপলিটন পুলিশ যাত্রা শুরু করেছে এক বছর হলো। তাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। এ বড় আনন্দের খবর।
মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে চাইব, শান্তিপূর্ণ শহর হিসেবে রংপুরের গৌরব যেন অব্যাহত থাকে। এ জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে মাদক নিয়ন্ত্রণে। এ জন্য স্কুল কলেজে প্রচারণা চালানো যেতে পারে। যাতে কিশোর তরুণেরা মাদকাসক্ত না হয়ে পড়ে। মাদকব্যবসা, মাদকচালান বন্ধ করে দিতে হবে। তাহলে দেখা যাবে, অর্ধেক অপরাধ কমে যাবে। চুরি, ছিনতাই থেকে শুরু করে গ্যাং কালচার উঠে যাবে।
এরপরের কাজ হবে অবৈধ অস্ত্র নির্মূল করা।
সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি বন্ধে পুলিশের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনগুলোকেও অবদান রাখতে হবে।
আমার মনে হয়, রংপুর এখনো দেশের একটা শান্তিপূর্ণ শহর হিসেবে গৌরবের সঙ্গে সুনাম ধরে রেখেছে। আরো ভালো হবে রংপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। আরো সুন্দর হবে রংপুরবাসীর জীবন।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এক বছরে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ: নাগরিক প্রত্যাশা

প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম •

বছর পূর্তি হলো রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের। মহাকালে এক বছর কোনো সময়ই নয়। কিন্তু একটি শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সূচনা বছর আলোচিত, পর্যালোচিত হতে পারে নানা মাত্রিকতায়। জনসম্পৃক্ততার জন্য বিষয়টিকে সীমাবদ্ধতায় আটকে রাখাও যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রসঙ্গ আসে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের যাত্রার এক বছরে কতটুকু পূরণ হয়েছে জন আকাঙ্ক্ষা। যতটুকু হয়েছে তার বাইরে অপূর্ণ যা, তা পূরণে কী-ই বা করার আছে।

কথা হলো কেন মেট্রোপলিটন পুলিশ? আটটি জেলা নিয়ে রংপুর বিভাগের যাত্রারম্ভ ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি। প্রায় আড়াই বছর পর গঠিত হয় রংপুর সিটি কর্পোরেশন। মহানগরের জন্য প্রয়োজন হয় বিস্তৃত পরিসরে পুলিশের কার্যক্রম। সে প্রয়োজন থেকেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঔদার্যে প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ২০১৮ এর ১৬ সেপ্টেম্বর। সংক্ষিপ্ত নাম- আরপিএমপি। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আকারের চেয়ে বড় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতা। সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২০৩ বর্গ কিলোমিটার, আরপিএমপির আয়তন ২৩৯.৭২ বর্গ কিলেমিটার। এমনটা হয়েছে মাহিগঞ্জ, হারাগাছ থানার অধীনে বেশকিছু ইউনিয়ন পরিষদকে অন্তর্ভুক্ত করায়। আরপিএমপি পুলিশ লাইন্স বুড়িরহাট রোডের তিন একর এলাকার ভাড়া বাড়িতে। থানার সংখ্যা ছয়টি। কোতয়ালি, পরশুরাম, তাজহাট, মাহিগঞ্জ, হারাগাছ এবং হাজীরহাট থানা। জনবল কাঠামোতে আছে- একজন কমিশনার, একজন অতিরিক্ত কমিশনার, দুজন উপ-কমিশনার, ৬ জন অতিরিক্ত উপ-কমিশনার, ১২ জন সহকারী কমিশনার, ২০ জন ইন্সপেক্টর, ১২০ জন এস আই ও ৭৫০ জন কনস্টেবল পদ। সূচনা ৪৭টি যানবাহন দিয়ে, পর্যায়ক্রমে সংখ্যা হবে ১২৩ টি।

পুলিশের আছে গর্বিত ইতিহাস, মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রথম বুলেট ছুড়েছিল পুলিশ। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ ভয়াল কালরাতে পাকিস্তানী হানদার বাহিনী অতর্কিত হামলা করে রাজাবাগ পুলিশ লাইন্স। সেসময় বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সাহসী পুলিশ সদস্যবৃন্দ।

‘পঁচিশে মার্চ
অন্ধকার তো ঘোচে না অন্ধকারে
সূর্যপ্রখর দীপ্তির প্রয়োজন
তাই তো মশাল জ্বেলেছি প্রাণের স্বরে
স্লোগানে দীর্ণ কারফিউ তর্জন
ব্যর্থ সকল সন্ত্রাসী গর্জন’

পাকিস্তান হানাদার সেনাদের সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে রাজারবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় শহীদ হয়েছেন শতাধিক বীর পুলিশ সদস্য। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন দেশপ্রেমিক ১৪ হাজার পুলিশ, শহীদ হয়েছেন ৭৩৯ জন সদস্য। আক্রান্ত হবার সাথে সাথেই সারা দেশের পুলিশ স্টেশনগুলোতে বেতারের মাধ্যমে বার্তা প্রদান করেছিলেন তখনকার ওয়্যারলেস অপারেটর কন্সটেবল শাহজাহান মিয়া। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত বার্তাও প্রচারিত হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের ওয়ারলেসের মাধ্যমে। পুলিশ সদস্যবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান, গভীর দেশপ্রেম নিয়ে থ্রি নট থ্রি র‍্যাইফেল দিয়েই জবাব দেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণের। নিঃশঙ্কচিত্তে লড়াই করে দেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য, উৎসর্গ করেন জীবন। বাঙালি পুলিশ সদস্যগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি পুলিশের কাছে থাকা অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুক্তিকামী মানুষের হাতে তুলে দেন। স্বাধীনতা অর্জনে পুলিশের অবদান বিশেষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ২০১৯ এ পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধন সময়ে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণীতে বলেছেন– 'মহান মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম ত্যাগ ও বীরত্বগাথার ইতিহাসকে ধারণ করে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে পুলিশ। সরকার পুলিশকে একটি দক্ষ, জনবান্ধব ও প্রতিশ্রুতিশীল বাহিনীতে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।'

বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশের প্রথম অসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। পুলিশ বাহিনীর প্রত্যয়–শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতি। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পথচলা শৃঙ্খলা, আস্থা এবং প্রগতি'র চেতনা ধারণ করে। রংপুরে মেট্রোপলিটন পুলিশের এক বছরের যাত্রায় সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমনটা ভাববার অবকাশ নেই। তবে সুবিধা যে অনেকটা বেড়েছে তা বলা যায় নিশ্চিত করে। মেট্রোপলিটন হবার আগে কোতয়ালী নামের একটিমাত্র থানার মাধ্যমেই চলেছে আইন-শৃঙ্খলাসহ জননিরাপত্তার বহুমুখী কর্ম। তখন যে সমস্যাগুলো ছিল তার মধ্যে অন্যতম–

*কম জনবল- যে জন্য অভিযোগ এলে বা অন্য প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দেয়া সম্ভব হতো না। এতে আইন-শৃঙ্খলার যথাযথ উনড়বয়ন ছিল কষ্টসাধ্য। পুলিশের যানবাহনের সংখ্যাও ছিল অপ্রতুল। যে জন্য মোবাইল টিম কম ছিল। লোকবল কম থাকায় গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিলে বিঘ্ন ঘটতো। ট্রাফিক পুলিশের সদস্য কম ছিল এজন্য যানযট নিরসন করতে হিমসিম খেতে হতো। একজন মাত্র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিরাট এলাকার সমস্যা নিয়ে তার সাথে সহজে দেখা করা বা কথা বলা বলার অবকাশ মিলত না। তাছাড়া কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সবার অধিক দায়িত্ব পালন করার কারণে বিশ্রাম কম হতো। চেকপোস্ট কম থাকায় অপরাধীদের অনেককেই থাকতো আওতার বাইরে। ডিএসবি'তে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় তথ্য সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটতো।

একটি থেকে ছয়টি থানা এখন। তাই মানুষের প্রত্যাশার পারদ অনেক উপরে। মেট্রোপলিটন পুলিশে বেড়েছে জনবল, যানবাহন, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। তাই মানুষের প্রত্যাশা– আইন শৃঙ্খলার সার্বিক উন্নতি হবে, আর তা হবে স্থিতিশীল। চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, জঙ্গী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ইভটিজিং, বাল্য বিয়ে, মাদক, খুন, গুম, ধর্ষণসহ বিবিধ অনৈতিক তৎপরতা নির্মুলে মেট্রোপলিটন পুলিশ রাখবে অগ্রণী ভূমিকা। অভিযোগ দায়েরের পর সাড়া মিলবে দ্রুত। তদন্ত হবে সুষ্ঠু, মানসম্মত, রহস্য উদ্ঘাটনে রাখবে নিরপেক্ষ ভূমিকা। আচার আচরণে পুলিশের সাথে জনগণের দূরত্ব ঘুচে যাবে, পুলিশ যথাযথই মানুষের বন্ধু হবে, হবে সেবক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে পুলিশ থাকবে নিবেদিত। রংপুর মহানগরের জনগণ প্রত্যাশা করে উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থার, যাতে যানজট কমে যায়। ফুটপাত থাকবে দখলমুক্ত। ছিনতাই, রাহাজানি যেন না হয় বাজার-হাটে, রাস্তা-ঘাটে। চেকপোস্টের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করা ও শাস্তির আওতায় আনার পদক্ষেপের প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের। কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাকে জোরদার করে সাধারণ মানুষ ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, বিপদে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার প্রয়াস বিস্তারও কামনা করে। নিরীহ, নির্দোষ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করার বিষয়টিও প্রত্যাশিত।

মানুষের প্রত্যাশার সাথে তাল মিলিয়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ মাত্র এক বছরে অনেকটাই এগিয়েছে। তবে সমস্যাও আছে। প্রয়োজনের তুলনায় এখনও যানবাহনের সংখ্যা কম। কোতয়ালী থানা ছাড়া অন্য পাঁচটি থানার নিজস্ব ভবন নেই। ভাড়া বাড়িতে কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পুলিশ লাইন্সও ভাড়া করা বড়িতে, তাই প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কর্মধারা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছে না। পুলিশ সদস্যগণের আবাসিক সংকটও আছে। চিকিৎসার জন্য পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল চালু হয়নি, রয়েছে মানসম্মত হাজতখানার অভাব।

জন আকাঙ্ক্ষা পূরণে দরকার সমস্যাগুলোর ত্বরিৎ সমাধান করা। এছাড়াও যত দ্রুত সম্ভব বিট পুলিশিং চালু করা আবশ্যক। বিট পুলিশিং হলো স্থানীয় এলাকা ভিত্তিক পুলিশ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান, যিনি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ করবেন, সভা, মতবিনিময়ের আয়োজন করবেন, বাসায় যাবেন, উঠান বৈঠক করবেন,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জন-প্রতিনিধিগণের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করবেন। এতে পুলিশের সাথে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে, পুলিশের উপর মানুষের আস্থা বাড়বে। দরকার প্রো-এ্যাকটিং পুলিশিং বা প্রতিরোধমূলক সেবা। বাড়াতে হবে গোয়েন্দা তৎপরতা। আগাম তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ঘটনা সংঘটিত হবার আগেই যদি প্রতিরোধ করা যায় সেটাই সর্বোত্তম। এতে ক্ষয়ক্ষতি কমে, জীবনহানীর শংকাও বিমোচিত হয়। গোয়েন্দা তৎপরতা যথাযথ হলে জঙ্গীবাদ মাথা চাড়া দিতে পারবে না, কমে যাবে সন্ত্রাস, ধর্ষণ, গুজব। মাদকাসক্তদের, মাদক বিপণনকারীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চরম হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। রংপুরে মাদকাসক্তের সংখ্যা কম নয়, অবৈধ বিপণনও আছে। তরুণরা অনেকেই মাদদকাসক্ত। এ অবস্থা উত্তরণে দোষীদের গ্রেফতার এবং উপযোগী শাস্তির ব্যবস্থা নিতে আরও তৎপর হতে হবে পুলিশকে। রাত ১০ টার পরে যেনো রাস্তার মোড়ে, খোলা মাঠে তরুণরা আড্ডা না জমায়, নেশা না করে সে দিকটি নিশ্চিত করা জরুরী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বখাটেদের আড্ডা, কোনো দোকান না থাকে সে পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থবানদের দাপটে গরীবরা কখনো যেনো ন্যায় হতে বঞ্চিত না হয় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে সে দিকে। পুলিশ রক্ষক, পুলিশ কখনো যেনো ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়– এমন নৈতিক আলো অন্তরে জ্বালানো একান্ত প্রয়োজন।

কিছু ঘটনা পুলিশের কর্মধারাকে উজ্জ্বলতা দেয়। দুর্ঘটনা কবলিত মানুষকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশ যখন নিজেই বিপদজনক ঝুঁকি নেয় – তা প্রশংসিত হয় সর্বস্তরে। রাস্তার ফেলে যাওয়া শিশুকে পরম আদরে কোনো পুলিশ যখন মমতা ও ভালোবাসায় লালন করার দায় নেয় তা পুলিশের মহানুভবতা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। জঙ্গী, সন্ত্রাসী, ধর্ষকদের ঠেকাতে পুলিশ নিজেই গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে কাতরায়, অথবা মৃত্যুর হীম-শীতল ছোঁয়ায় পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয় তখন মানুষ তার জন্য চোখের জল ফেলে। জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ কাটায় বিনিদ্র প্রহর, অপশক্তির আঘাতের শংকা নিয়ে স্বস্তির বসবাস নিশ্চিত করে নাগরিকের। রংপুর মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্মধারাতেও মানুষ অনেকটাই আস্থাবান। রোজায় দুস্থ মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করেছে পুলিশ। ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষের সেবা দিয়েছে, সচেতনতা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে বৃদ্ধি করেছে জনসচেতনতা। রংপুর বই মেলায় অংশ নিয়ে জাগ্রত করেছে নবতর বোধ। মানুষ যেনো মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারে সে জন্য কর্মকর্তাগণের ফোন নম্বর ও কোন এলাকা কোন থানার অধীন তা জানিয়ে স্মরণিকা, প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। কিছু বিলবোর্ডে প্রদান করা হয়েছে নানা তথ্য। কমিউনিটি পুলিশিং এর আয়োজনে র‍্যালী, আলোচনা ও মতবিনিময় প্রশংসা অর্জন করেছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মধারা সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি অনেকটাই মিশ্র–

তরুণ বই ব্যবসায়ী মাহমুদ হাসান পাভেল বলেন– 'আশাবাদী আমরা, আশা পূরণের কাছাকাছি আমরা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা পুলিশের দায়িত্ব, কিন্তু রংপুরের পুলিশকে সামাজিক কাজের মধ্যে পেয়েছি। বিশেষ করে বই মেলার কথা বলতে পারি। রংপুর বই মেলা–১৯ এ স্টল নিয়েছিলো মেট্রোপলিটান পুলিশ। ভালো ভালো বই রেখেছে ভালো বিক্রিও করেছে । বিভিন্ন ভালো কাজের সাথে তারা আছে, ডেঙ্গু সচেতনতা, সরকারের উন্নয়নের কাজে সহায়তা প্রদান করছে। নাগরিক সেবায় সম্পৃক্ত থেকে মহানগরে করছে ইতিবাচক কাজ। বলা যায় অল্পসময়ে ভালো কাজ করছে। তবে এলাকা বিস্তৃত– তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা কার্যক্রম কিছুটা ব্যহত হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সেবা বিস্তৃত হলে সেবার পরিধি বাড়বে, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বাংলাদেশের মধ্যে এগিয়ে থাকবে।'

রংপুর সচেতন নাগরিক কমিটি'র (সনাক) সভাপতি মোশফেকা রাজ্জাকের প্রত্যাশা দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ প্রশাসন। তিনি বলেন– পুলিশ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা গেলে সুশাসন সহজেই প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বস্তি পাবেন সাধারণ মানুষ। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তৎপরতায় রংপুর নগরে যানযটের তীব্রতা অনেকটা কমে গেছে বলে মনে করেন তিনি। মানুষ হেলমেটে অভ্যস্ত হয়েছে চেকপোস্ট জোরদার করায়। তবে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে ও সম্পূর্ণ যানজট নিরসনে তিনি ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবস্থা চালুর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকার্তবৃন্দের কাছে দাবী জানান। থানায় নেয়ার পর গ্রেফতারকৃতদের প্রতি সদাচরণ করা হবে এমনটাও তাঁর কাম্য।

রংপুর জজ কোর্টের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম সিথিলের মতামত হলো– রংপুরে মেট্রোপলিটন পুলিশ হওয়াতে রংপুর শহরের মোড়ে মোড়ে সন্ত্রাসী ও বখাটে ছেলেদের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। মটরসাইকেল, হাল্কা ও ভারী যানবাহন বেশি ধরা পড়ছে, মামলাও বেশি হচ্ছে। ছয়টি থানা হওয়াতে তদন্ত, পর্যবেক্ষণ স্বচ্ছ ও সঠিক হচ্ছে। ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৫৪ ধারার পাশাপাশি ৭২ বা ৭৪ ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যেতে পারছে। সিথিল বলেন – সন্ত্রাস আরও কমাতে হবে, ইয়াবা, ফেন্সিডিলসহ মাদক নির্মূলে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

শিক্ষার্থী রুবানা ইয়াসমিনের চাওয়া- নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ আরও সচেতন ও কর্তব্য পরায়ণ হবেন। তা হলে মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। কমে যাবে নারী ও শিশু নির্যাতন।

তরুণ জাহিদ হাসান বলেন– 'পুলিশ আপনার বন্ধু, নিরাপত্তার যে কোনো প্রয়োজনে পুলিশের সহায়তা নিন' বাংলাদেশ পুলিশের এ আহ্বান মেনে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ যেনো যথাযথ সহায়তা প্রদান করে এটাই আমার চাওয়া।'

রংপুরের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকগণের প্রত্যাশা– রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্যগণ দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় আরও সচেষ্ট হবেন। ভব্যতা, শালিনতা, মানবাধিকারের মান রেখে দায়িত্ব পালন করবেন। আইনের বিধিবিধান মেনে সেবা প্রদান করবেন, নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে সংযত আচরণ করবেন। প্রয়াস অব্যাহত রাখবেন নির্দোষ ও নিরীহ নাগরিকের ভোগান্তি ও দুর্দশা লাঘবে । তদন্ত করবেন নির্মোহ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে, বিরত থাকবেন স্বেচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে। আত্ম-অনুসন্ধানের মাধ্যমে কল্যাণী কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করতে থাকবেন। দেশের মানুষের স্বার্থে বিসর্জন দেবেন আত্মসুখ। যে কোনো অপতৎপরতাকে রুখে দেবেন অসীম সাহসে।

পুলিশের কর্ম উদ্যোম আরও বাড়ানোর জন্য– নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতার থানাগুলোর নিজস্ব ভবন তৈরি, আবাসন সংকট দূর, চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল চালু করা বিশেষ জরুরী। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশসংনীয় অবদানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদানের পদক্ষেপ নিতে হবে। জঙ্গি, সন্ত্রাস মোকাবেলা ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পুরস্কার ও সম্মানিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। আবার অপরাধ করলে নিশ্চিত করতে হবে শাস্তি। কতিপয় পুলিশ সদস্যের অনৈতিক ও দায়িত্বহীন কর্মের দায়ভার পুরো পুলিশ বাহিনী নিতে পারে না।

শান্তিময় বসবাসের জন্য নাগরিকগণেরও সচেতনতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমন প্রবণতার বড়ই অভাব। এজন্য বিদায়ী ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া আক্ষেপ নিয়ে বলেছেন– 'বেশিরভাগ মানুষ অপরাধ করলে পুলিশকে দিয়ে আইন প্রয়োগ করা অসম্ভব। তাই সবার আগে আইন মানার সংস্কৃতি চালু করতে হবে।' দেশের সব নাগরিককে এ দিকটি গুরুত্ব দিয়ে আইন মেনে চলায় আন্দরিক ও অভ্যস্ত হতে হবে। তবেই শৃঙ্খলা ফিরবে সমাজে।

রংপুরের নাগরিকগণ চান নিরাপদ, নির্বিঘ্ন, স্বস্তি ও শান্তিময় বসবাস। আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ তা নিশ্চিত করবেন এমন বিশ্বাস তাঁরা লালন করেন অন্তরে। ইতিবাচক তেমন আশা নিয়ে নাগরিকগণের প্রত্যাশা– সাফল্যের আলো মেখে সামনে এগিয়ে যাবে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ।

ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা
কারমাইকেল কলেজ
রংপুর; সাহিত্যিক, সংগঠক

মাস্টার প্যারেড.....

পরিদর্শন প্যারেড.....

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় রংপুর

মোঃ আসিব আহসান •

"আমার দেশের প্রতিটা মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে,
উন্নত জীবনের অধিকারী হবে - এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন"
-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে দুর্বার গতিতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তাঁরই কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে সরকার গঠনের প্রাক্কালে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর যে স্বপ্ন জাতিকে দেখিয়েছিলেন তা ছিল জাতির প্রতি তাঁর দৃঢ় অংগীকার এবং আজ তা সোনালী বাস্তবতা। শুধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত নয়, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেন স্বমর্যাদায় আসীন হতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১, ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বজনীন উন্নয়নমূলক ভাবাদর্শ ও নেতৃত্ব কল্যাণমুখী রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিটি প্রান্ত উন্নয়নের আওতাভুক্ত হচ্ছে। রংপুরের উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা দর্পণ। রংপুরের ২০০৯-২০১৮ সাল পর্যন্ত উন্নয়নের যে যাত্রা তার বিস্তৃতি এবং সার্বিক চিত্র এই স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ সময়ে উন্নয়নের চৌম্বক অংশগুলোই প্রমাণ করে কিভাবে সরকারের এক দশকের গতিশীল নেতৃত্বের সাফল্যে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হতে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র রংপুর।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন :

ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম একটি জেলা রংপুর । প্রাচীন কাল থেকে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি, মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বর্পূণ অবদান রাখলেও এ অঞ্চলের অন্যান্য জেলার মত রংপুর জেলার উন্নয়ন ছিল সুদুর পরাহত। দারিদ্র্যের দুষ্টুচক্রে এ জনপদের অর্জন ম্লান হচ্ছিল দিনের পর দিন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সহজাত বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে অনুধাবন করলেন এ অঞ্চলের উন্নয়নের গুরুত্ব। গ্রহণ করলেন এক দুরদর্শী সিদ্ধান্ত। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ৮টি জেলা তথা রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাও, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় নিয়ে রংপুর প্রশাসনিক বিভাগ স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গঠিত হল রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার বিল, ২০০৯ এর মাধ্যমে রংপুর পৌরসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারি রংপুর জেলা সফরকালে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ মহান জাতীয় সংসদে রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ পাশ হয়। রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও হারাগাছ পৌরসভার অংশবিশেষ এবং পীরগাছা থানার কল্যানী ইউনিয়ন (আংশিক), কাউনিয়া থানার

সারাই ইউনিয়ন (আংশিক) এর সমন্বয়ে প্রাথমিকভাবে ২৩৯.৭২ বর্গ কি. মি. আয়তন বিশিষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন করা হয়।

উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ

বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রংপুরে ১টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ এর ২য় পর্যায়ের মহিলা হোস্টেল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। ১ম ও ২য় তলা হোস্টেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৩৪৬৮ লক্ষ টাকা। গঙ্গাচড়ায় মডেল থানা (৩ তলা ভবন) নির্মাণ, মাহিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণসহ জেলা পুলিশ রংপুরের উন্নয়নে ২১ টি নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। "বাংলাদেশের ৪টি মেরিন একাডেমী স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রংপুরে একটি মেরিন একাডেমী নির্মাণ এর আওতায় একাডেমিক ভবন, ডরমেটরী ভবন, কমান্ড্যান্ট এর বাসভবন, মসজিদ, সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম গ্যালারি, প্যারেড স্কয়ার নির্মাণ কাজ চলছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলার সকল উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য জাদুঘরসহ লাইব্রেরি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিসও মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটসহ ৭৫০০ বর্গফুটের ভবন তৈরি করা হয়েছে। পাঁচতলা ভিত্তির এ ভবনগুলোতে আপাতত তিনতলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় ১৫৯২ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৮টি উপজেলায় ২৩ টি বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ২৮.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সৌধ নির্মাণ এবং মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৮৫.৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ২০১৬-২০১৮ অর্থ বছরের মধ্যে "পীরগঞ্জ উন্নয়ন" প্রকল্পের চলমান কাজে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২১২৮.৪৮ লক্ষ টাকা যা রংপুরের উন্নয়নে অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা বহন করে। ২০০৯-২০১৮ সময়ে রংপুর জেলায় মোট ১৬১২ কোটি টাকা ব্যয়ে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ প্রকল্পের ৪টি ও ৩২ টি হাট বাজার/ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বাড়াতে এ ধরণের উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে রংপুরের মিঠাপুকুরে ৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন শঠিবাড়ি এলএসডি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষিখাতে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি প্রণোদনা প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ফলে রংপুরে গত দশ বছরে ধানের উৎপাদন ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৯-২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত বর্তমান সরকারের সময়ে সাংস্কৃতিবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে নানাবিধ উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি কমপ্লেক্স এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় জুন ২০১৭ সালে যেখানে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৭ কোটি টাকা।

বিগত ১০ বছরে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৪০০ হেক্টর জমির পানিসম্পদ উন্নয়ন করা হয়েছে। ১২টি উপ-প্রকল্পে ৬০ কিলোমিটার খাল খনন, ২২ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ এবং ৪টি স্লুইসগেট/রেগুলেটর/রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গংগাচড়া উপজেলায় প্রায় ১৪ কিঃমিঃ নদীর তীর সংরক্ষণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এর ফলে গংগাচড়া উপজেলাসহ রংপুর শহর বন্যা হতে রক্ষা পাচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ সালে নদীর তীর রক্ষামূলক কাজ ৬.০৫১ কিলোমিটার সমাপ্ত হয়েছে এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও সেচখাল মেরামত করা হয় ২০ কিলোমিটার। এছাড়াও প্রায় ১৮০০০.০০ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। নদীর তীর রক্ষাসহ নদীর তীরবর্তী অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে এবং নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নঃ-

"শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ"

প্রান্তিক পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত নিজস্ব উদ্যোগ কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম। রংপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গত ১০ বছরে ২৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রংপুর

জেলার গংগাচড়া, পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, তাজহাট, রংপুর এর নির্মাণে বরাদ্দের পরিমাণ ১৫৯৮.৮৮ লক্ষ টাকা। গংগাচড়া, পীরগাছা, তারাগঞ্জসহ বিভিন্ন উপজেলায় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র নির্মাণ, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণসহ বিভাগীয় পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অফিসের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ২০১০-২০১১ সালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

শিক্ষা খাতঃ-

"শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

স্কুলগামী ও ঝরে পড়া সকল শিশুর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বিগত দশ বছরে দেশে ঝরে পড়ার হার প্রায় ৩২% হ্রাস পেয়েছে। ২০০৯-২০১৮ সময়ে রংপুর জেলায় ৪৮৩টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, ২৫৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ সম্প্রসারণ, ১ টি পিটিআই অডিটোরিয়াম এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এতে মোট ১৫৯৪২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ৯০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর স্থাপন প্রকল্প (২০০৮-২০১২) বাস্তবায়িত হয়েছে ।

যোগাযোগ খাতে উন্নয়ন :

বিগত এক দশকে যোগাযোগ খাতে রংপুর জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে "গংগাচড়া শেখ হাসিনা সেতু" যা গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিস্তা নদীর উপর ৮৫০ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটি নির্মাণের ফলে লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দরসহ উক্তজেলার ৪ টি উপজেলার সাথে রংপুর শহরের দূরত্ব কমেছে প্রায় ৫০ কি.মি। জয়ন্তপুর ঘাটে করতোয়া নদীর উপর প্রস্তাবিত ২৯৪ মিটার ব্রিজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও নুনদহ ঘাটে করতোয়া নদীর উপর প্রস্তাবিত ৩০১মিটার ব্রিজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ২০০৯-২০১৮ সময়ে রংপুর জেলায় মোট ৫৭,৭৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৭,২৫০ কিলোমিটার পল্লী সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি ১২,৫১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৩৩,২৮৫ কিলোমিটার পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২২,৫০০ কিলোমিটার সড়কের নির্মাণ কাজ চলমান। ২০০৯-২০১৮ সময়ে রংপুর জেলায় মোট ৭৮১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,৭৫,০১৩ মিটার কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৮,৫০০ মিটার সেতু কালভার্টের কাজ চলমান রয়েছে। সাদুল্লাপুর - পীরগঞ্জ - নবাবগঞ্জ জেলা সড়কের ২৭ তম কিলোমিটার ডঃ ওয়াজেদ মিয়া সেতু প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিনিয়োগ:

"শেখ হাসিনার নির্দেশ, বিনিয়োগ চাঙ্গা বাংলাদেশ"

রংপুর জেলার ব্র্যান্ডিং শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়নে রংপুর ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলায় ৪৫ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১১৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ১৩২ জন তাঁতীকে ৬৬০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার ফলে ৪২০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌ চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৮৪ জন লোককে মৌ চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৯০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে ৮৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৭৩০ মে. টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ৯৭৯০ হে. জলাশয় পুনঃখনন করে মাছ চাষের উপযোগী করা হয়েছে। ১৪,০০ জন মৎস্যজীবীকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচয়পত্র দেয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে, ২০১৮ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৬৬৮.২৫ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ব্যক্তি খাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে নানামুখী সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বিকাশে রংপুর জেলায় বিসিক শিল্পনগরীতে ২০৬৮ একর জমির উপর ৮২টি শিল্প পটে ২৭টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে এবং বর্তমানে সবগুলো চালু রয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪,৫০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। শিল্প নগরী থেকে প্রতি বছর জিডিপিতে অবদান ১৫৫৬ কোটি টাকা।

আশ্রয়ণ প্রকল্প:

"আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার"

রংপুর জেলায় সর্বমোট আশ্রয়ণ (ফেইস-২) ও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫১৬টি ব্যারাকে ৪৪২০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পীরগাছা উপজেলার 'মকসুদপুর খাঁ' আশ্রয়ণ প্রকল্প ও গংগাচড়া উপজেলার 'সখেরহাট' আশ্রয়ণ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া "যার জমি আছে ঘর নেই তার নিজ জমিতে ঘর নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় গত তিন অর্থ বছরে ৩২.৯৩৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর দেওয়া হয়েছে ৩২৫৩ টি। এছাড়াও ৪৭০৬ জন উপকারভোগীর মাঝে ৮১৪৮ একর কৃষি জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত:

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

২০০৯ সালে সরকার ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ২০২১ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত কল্পে সরকার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। রংপুরে ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের ১০ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে ১১৫ কোটি টাকা। বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা পূর্বে (২০০৯ সালে) যেখানে ছিল ৪০৮৬৬ সেখানে বর্তমান (২০১৮ সালে) গ্রাহক সংখ্যা ৯১৯৮২। ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ছিল ৪৭% আর ২০১৮ তে এসে দাড়িয়েছে ৯০%। রংপুর জেলার সদর, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, তারাগঞ্জ, পীরগাছা ও কাউনিয়া উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতের আওতাভুক্ত। বদরগঞ্জ ও গঙ্গাচড়া উপজেলা এ বছরের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতের আওতাভুক্ত হবে ।

নারীর ক্ষমতায়ন:

"শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি, নারী জাগরণের অগ্রগতি"

প্রান্তিক পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রসব সেবা পরিচালনা করা হচ্ছে। দরিদ্র মায়েদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ২৯১৪টি ক্লিনিক। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল, দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এবং উপজেলা পর্যায়ে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি কর্মজীবী মহিলাদের জন্য সারা দেশে মহিলা হোস্টেল পরিচালনা করা হচ্ছে। সাভার ও গাজীপুরে নারী গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য দুটি কলোনী নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নির্যাতিত নারীদের আইনীসহ সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের জন্য ৬ টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, রংপুর এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৬৩৫,১৬ উপকারভোগীকে ১০৪.২৩ টন খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ

"শেখ হাসিনার বারতা, গড়ো সামাজিক নিরাপত্তা "

সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে যেখানে বরাদ্দ ছিল ২.৩৭৩ কোটি টাকা সেখানে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ ৬৪ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত-ক্তা ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল, দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ভাতা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, এতিম শিশুদের খোরাকি ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা উল্লেখযোগ্য। খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে ওএমএস, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি, জি আর, ভিজিএফ, ভিজিডি, কাজের বিনিময়ে টাকা ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় রংপুরে সকল ভাতা প্রদান কার্যক্রমঃ

এ পর্যন্ত রংপুর জেলায় বয়স্ক ভাতা পেয়েছে ৭১৭৪৬ জন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ২৭,৭৬০ জন, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ১২৯৯ জন, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক কার্যক্রমে ৬৫ জন, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ২৬৪ জন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ২২২৯ জন, নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমে ৭৩৩ জন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে ৮০২ জন, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ২০০ জন, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে ৩৪১৭ জন এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ৩০ টি। রংপুর জেলায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ১৮২ টি সমিতিতে ভিক্ষুক অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে মোট ৯৪৪ জন। কার্যক্রমের সাথে জড়িত তহবিলের পরিমান ৪৫,৩১,২০০ টাকা। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ৫৭,৫৫৮ জন কে। আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ২৩০৪০ জন কে। পুঁজিপ্রবাহ বা স্বল্পসুদে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে ৫০২৭.১৩ লক্ষ। গত ১০ বছরে রংপুরে অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৩গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে অভিবাসী কর্মীদের পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হচ্ছে।

২০২১ সালের মাঝে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি অর্থনীতি মানবসম্পদ উন্নয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বেগম রোকেয়া, দেবী চৌধুরানী, মধ্যযুগীয় সাধক কবি হেঁয়াত মামুদ এর স্মৃতিধন্য জন্মভূমি সুপ্রাচীন জেলা এই রংপুর। শ্যামাসুন্দরী, ঘাঘট, আখিঁরা, তিস্তা, যমুনেশ্বরীর মতো নদ-নদী, প্রকৃতি আর মানুষের সরলতায় গ্রন্থিত হয়েছে এ জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি চর্চা। সময়ের পথ পরিক্রমায় রংপুর এখন এক পালাবদলের নাম যার বাহন হলো উন্নয়ন আর নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রংপুর এখন তার সকল প্রাচুর্য নিয়ে সকল সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তরের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দূর্বার গতিতে যার গন্তব্য ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

জেলা প্রশাসক
রংপুর

Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing-Role of Bangladesh Police

Md. Mohidul Islam •

As the global GDP has increased in the last two decades, so too has the magnitude of all-source money laundering. The IMF and World Bank estimate that 3%-5% of global GDP is laundered-approximately $2.17-$ 3.61 trillion annually. Narco-traffickers, kleptocrats, transnational organized criminals are but three significant entities that engage in the effort to disguise their illegal proceeds derived from more than 300 predicate crimes. When criminals (including corrupt officials) and organized crime syndicates disguise the illicit nature of their proceeds by introducing them as legal funds into the stream of legitimate commerce and finance, they not only are clandestinely hiding their ongoing affairs but they are also tainting the international financial system and eroding public trust in its integrity. Although some of the funds used to finance terrorism have come from non-laundered funds donated to dual-purpose charities, through the formal financial sector, the amount that has been blocked globally in the formal sector is less than $170 million dollars. Although international institutions argue that terrorist financiers are employing “new modalities”, in fact, the opposite is true. Terrorist financiers are reverting to traditional ways such as hawala, trade based money-laundering, and cash couriers, particularly in countries with non-existent or weak national anti-money laundering systems to move their funds to finance their terrorist activities.

When money is laundered, criminals are rewarded with disguised and apparently legitimate proceeds. Similarly, those who finance terrorism are rewarded by providing the financial support to carry out terrorist strata-gems and attacks.

Since 9/11 terrorist attacks, national and international compliance and regulatory frameworks rapidly expanded to include combating money laundering and the financing of terrorism as a central focus. Both are transnational, cross-border, multifaceted, and complex problems that require cooperation and coordination among actors looking to successfully respond to them. Not only do money laundering and terrorist financing negatively affect the integrity and stability of the financial sector, but they also undermine national security and economic development goals. Strong measures on anti–money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT) can help mitigate criminal behavior by reducing or eliminating the economic gain from criminal activities. The consequences of terrorist activities are terrific and devastating. With a special attention on the existing circumstances of money laundering and terrorist financing in Bangladesh, the role of Bangladesh Police in anti-money laundering and counter terrorism financing management is highly challenging within the transnational crime context.

Challenges and Law Enforcement Responses

In this era of globalization, crime and the associated money laundering activities are inherently transnational in nature, and nomadic by definition. However, incompatibilities arising from differences in political, legal, and social systems present barriers and hence hamper the effectiveness and efficiency of law enforcement efforts. Political ideologies, institutional arrangements, and social settings dictate law enforcement priorities and responses. In jurisdictions of socio-political marginalization and poverty, national security and social stability are priorities; crime, not to mention money laundering, becomes only a secondary concern in such jurisdictions. Criminals are highly efficient at exploiting these incompatibilities to create a low risk environment for their criminalities. It has long been a trend that criminals move their operations to jurisdictions which present a lower risk of enforcement action. LEAs are increasingly encountering criminalities where criminals reside well beyond the jurisdiction(s)in which their crimes are perpetrated.

While globalization makes the jurisdictional borders for criminalities increasingly vague, jurisdictional borders for law enforcement are increasing in relevance with more bureaucracy and protocol required in their dealings as a result of growing public expectations for human rights and governance transparency. As a result they are not very capable of providing the type of assistance required in the pursuit of complex transnational crime. Others simply are not willing to do so because of political reasons, corruption, or other factors, and it is fair to say that there have been frustrations in dealing or working with these jurisdictions. Even with proper mutual legal assistance mechanisms in place, LEAs are very often highly frustrated at the time such requests take and the delays encountered.

Criminals are increasingly opportunistic and decreasingly discriminating, choosing to engage in a wider variety of criminalities. There is no obvious leadership in a network and the network exists transiently; such structural changes are noted to have a significant impact on law enforcement efforts. Law enforcement response needs to be fast as the window in which to collect evidence and develop leads closes quickly. A fast or pre-emptive law enforcement response is achievable through Intelligence-Led Operations, but that is not always possible and in practice is not at all easy.

Despite these significant challenges law enforcement agencies have never been given the full range of necessary resources and powers to do their job. It is fair to say that a level playing field has never existed between law enforcement and crime. On the contrary, law enforcement powers are increasingly restricted as a result of growing public awareness and expectations on rights.

Bangladesh: Vulnerable to illegal asset transfer

The socio-eco-political context of Bangladesh is such that it makes the country vulnerable to illegal transfer of assets outside the country as a result of which Bangladesh faces a range of money laundering threats. Following are the most common predicate offences generating substantial criminal proceeds which are the main sources of money laundering: bribery, abuse of public office, securities fraud, embezzlement, human trafficking, extortion, and drug trafficking etc.

Out of all mentioned above, Bangladesh authorities highlights corruption, drug trafficking and human trafficking as the most serious sources of illegal transfer of money. According to the estimate of World Bank national proceeds of corruption is worth more than 3% of GDP.

In addition to the above the location of Bangladesh in between the golden triangle and golden crescent makes it further vulnerable to illegal inflow and out flow of assets/money.

The prevalent insurgencies and extremist and terrorist activities in countries around Bangladesh often help create various issues which in turn increase the chance of money laundering from Bangladesh.

Besides, Bangladesh has a cash based economy. The common methods of laundering proceeds are structuring transactions through the banking sector and bulk cash smuggling. Alternative remittance system (HUNDI) is a common phenomenon in Bangladesh for sending illegal money abroad. Hundai transition does not leave any record and therefore is no chance of auditing. Therefore, the laces enforcing agencies can't detect any information for taking actions against these illegal transactions. Hundi system of many transfers is preferred for a number of reasons i.e. money can be transited easily and quickly, transaction can cover remote areas, can be transferred hand to hand, less transaction cost involved, exchange rate is attractive, no down required, no evidence is left, any can be involved.

Process of Money Laundering and Terrorist Financing

Today, ill-gotten gains are produced by a vast range of criminal activities—among them political corruption, illegal sales of weapons, and illicit trafficking in and exploitation of human beings. Regardless of the crime, money launderers resort to placement, layering, and integration in the process of turning illicit proceeds into apparently legal monies or goods.

- PLACEMENT : Physical disposal of cash proceeds of illegal activity, the initial entry of the funds into the financial system
- LAYERING: Separating illicit proceeds from source by creating layers of financial transactions designed to disguise audit trail and provide anonymity.
- INTEGRATION: Providing apparent legitimacy to proceeds and allow them to re-enter the economy so that they appear to be legitimate investment funds.

Strategy to prevent money laundering and terrorist financing

Bangladesh has been actively pursuing anti money laundering steps since 2000. Bangladesh joined Asia Pacific Group (APG) since its inception in the year 1997 and commenced to prepare and pass an AML statute. It was the first jurisdiction in the SAARC region to pass stand-alone AML legislation with passage of the Money Laundering prevention Act (MLPA) in 2002.Focusing on implementing effective AML measures is a priority of the Government of Bangladesh, particularly in the banking, non-bank financial institutions, money exchange house and insurance sectors. Recently the securities market has also been included under the umbrella. Consummating the international initiatives like Vienna Convention- 1988, FATF (Financial Action Task Force)- 1989, FATF 40+9 Recommendations- 1990/2001, Palermo Convention-2000, UN Convention against Corruption (UNCAC)-2003, FSRB (FATF Style Regional Bodies), APG, NCCT (Non- Cooperating Countries and Territories), EU Directives on ML/FT, Bangladesh advances a lot to establish the institution frame work for combating money laundering and terrorist financing; as-

Ministry of Finance (MoF): The finance Division coordinates with the ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs concerning AML/CFT laws including drafting regulations to the MLPO and Money Laundering Prevention Act (MLPA).

Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh): Bangladesh Bank is the government entity that is responsible for administering the MLPA 2012 and is responsible for implementing a number of TF provisions contained in the ATO 2008.

Law Enforcement Agencies: It is administrated by Home Ministry. Major units within the police include the Criminal Investigation Department (CID), Special Branch (Intelligence), training institutes and a number of metropolitan and regional police forces though Bangladesh Police has a little role to investigate ML offences.

National Board of Revenue (NBR)-Taxation and Customs: The NBR is the taxation and customs authority of Bangladesh formed under The National Board of Revenue Order, 1972-President's Order No.76 of 1972, NBR is under the Internal Resources Division (IRD) of the Ministry of Finance (MoF) who also try to track black money and illegal transaction through taxation and custom intelligence unit.

Boarder Guard, Bangladesh (BGB): BGB is a paramilitary force whose principle role is border security, and includes investigating smuggling across Bangladesh's borders.

Investigation of Money laundering and terrorist financing offences

AS Per Section 2 and 9 of the MLPA-2012(Amended on 2015) the Investigating agencies are-

- Police (CID)
- ACC
- Other (depending on the Predicate Offence)
- Any joint bodies assigned by the BFIU with the consultation of the Government.

Establishment of the Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) under Section 24 of MLPA-2012

BFIU undertakes the role in supervising AML/CFT preventative measures; as-

BFIU undertakes the role in supervising AML/CFT preventative measures; as-

(1) In order to exercise the power and perform the duties vested in Bangladesh Bank under section 23 of this Act, there shall be a separate unit to be called the Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) within Bangladesh Bank.

(2) For the purposes of this Act, the governmental, semi-governmental, autonomous organizations or any other relevant institutions or organizations shall, upon any request or spontaneously, provide the Bangladesh Financial Intelligence Unit with the information preserved or gathered by them.

Punishment of Money Laundering and terrorist financing

Provision of the Section 4 of the Money Laundering Prevention Act-2012:

(i) For the purpose of this Act, Money Laundering shall be deemed to be an offence.

(ii) Any person who commits or attempts to commit the offence of Money Laundering or abets or conspires in the commission of such offence shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 12 years but not less than 4 years + a fine of Taka 10 lakh (or up to double amount of the laundered money).

(iii) and money or property derived from the commission of such offence shall also be forfeited to the state.

(iv) If any legal entity (such as company) is found guilty then the punishment is : A fine of Taka 10 lakh (or up to double amount of the laundered money) and the registration of the company will be cancelled.

(v) Conviction in the predicate offence will not be a precondition of accusing or penalizing for the offence of Money Laundering.

Conclusion

In Article 51 of UNCAC (UN Convention against Corruption): General provision states that the return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard. It is obvious that Bangladesh is considerably newly active nation in the National and International arena in this aspect of combating illegal transfer of assets abroad and recovery of the same. The asset recovery provision of UNCAC action such as prevention and detection of transfer of proceeds of crime, measures for direct recovery of property, mechanisms for recovery of property through international cooperation in confiscation, return and disposal of asset etc. are very helpful for perusing the recovery of asset for less advanced countries. However in order to reap benefit out of these provisions respective parties must have enabling infrastructure, minimum expertise and institutional strengths. Bangladesh strives strong to derive full support from the international bodies at the present state of preparation. Initiatives have been taken so that the proceeding of money laundering related cases inside Bangladesh dose not take longer time in obtaining court verdict required for recovery of assets from outside the country.

It is learnt from the Bangladesh Bank that so far it was possible to conclude agreements for mutual legal assistance with nine countries only. We have to go a long way ahead in this regard. Bangladesh also has to find its way for tapping benefit from all international agencies which are helpful for recovery of assets. It requires competent expertise and resources. Bangladesh police possesses a glorious history of excellence, expertise and specialization working in international arena under UN DPKO along with investigation skills, knowledge, training and studies in law for dealing with crimes inside Bangladesh. They have experience in investigation and prosecution of predicate crimes which give rise to the illegal proceeds for money laundering and terrorist financing. So police need to be incorporated with investigation authority for competent and quick disposal of money laundering and terrorist financing cases. Besides, International cooperation in line with the spirit of UNCAC (UN Convention against Corruption) is very much required for the purpose.

Deputy Police Commissioner
(HQ and Admin)
Rangpur Metropolitan Police

গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট....

গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে নিরাপত্তা প্রদান....

রংপুর জেলার জানা-অজানা যত নদ-নদী

ড. তুহিন ওয়াদুদ •

আমাদের দেশের প্রকৃত নদ-নদীর সংখ্যা এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড যে তালিকা করেছে তাও অসম্পূর্ণ। ফলে সারাদেশের মতো রংপুরের নদ-নদীরও নির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। তবে গত কয়েক বছর রংপুরে সরেজমিন ঘুরে, আমি বেশ নতুন নতুন নদীর সন্ধান পেয়েছি। যেগুলো অতীতে অনেক বড় নদী ছিল, কিন্তু বর্তমানে অনেক শীর্ণকায়। স্থানীয়ভাবে সেগুলোর পরিচিতি এখনো নদী হিসেবেই আছে। রাষ্ট্রীয় পরিচর্যায় নদীগুলোকে শতভাগ পূর্বের অবস্থায় ফেরানো না গেলেও যে অবস্থা আছে তা অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব। এমনকি অনেক দখল উচ্ছেদ করে নদীর প্রাণপ্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাহলে এগুলো আর কখনোই বিলুপ্ত নদীতে পরিণত হবে না।

রংপুর জেলায় নদীর সংখ্যা অনেক। এ পর্যন্ত ২৯টি নদী পাওয়া গেছে। আমি এই ২৯টি নদীর পাড়েই গিয়েছিলাম। এ নদীগুলোর ছবিও ধারণ করেছি। নদীগুলো–আখিরা, আলাইকুড়ি, ইছামতী, কাফ্রিখাল, কাঠগিরি, খটখটিয়া, খোক-সাঘাঘট, ঘাঘট, ঘিরনই, চিকলি, টেপরীরবিল, তিস্তা, তিস্তা (নতুন), ধুম, নলেয়া, নেংটি ছেড়া, যমুনেশ্বরী, বুড়াইল, বুড়াইল (নব্দিগঞ্জ), বাইশাডারা, ভেলুয়া, বুল্লাই, মরা, মানাস, মাশানকুড়া, সোনামতি, শাখাচিকলি, শালমারা, শ্যামাসুন্দরী।

রংপুরের এত নদী থাকলেও এগুলো নদীর স্বীকৃতি নেই। এ নদীগুলোর অতীত খুবই সমৃদ্ধ ছিল। প্রবীণ যারা আছেন, তাদের কাছে এসব নদীর অনেক খবর এখনো পাওয়া যায়। এ নদীগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবেই এ অঞ্চলের জনজীবনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এখনো আছে। রংপুর শহরের চারদিকে জালের মতো ছড়িয়ে আছে এসব নদী। এনদীগুলোর পানি গিয়ে পড়েছে- ব্রহ্মপুত্র-যমুনায়। ব্রহ্মপুত্র যমুনায় মিলিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে এ পানি চলে যায় সমুদ্রে।

আলাইকুড়ি নামের একটি নদী আছে। অনেকেই এ নদীর খবর জানেন না। এ নদীর উপকারিতাও অনেক ছিল। এখন নদীটি অনেক স্থানে অনেক শীর্ণকায়। তলদেশ ভরাট। কোথাও কোথাও সমতলে পরিণত হয়েছে। এ নদীটিও প্রচুর পানি বহন করে। নদীটি রংপুরে মাহিগঞ্জ থেকে প্রবাহিত হয়ে পীরগাছায় ঘাঘটে মিলিত হয়েছে। আলাইকুমারী নামেও একটি নদী হারাগাছ এলাকায় ছিল। আলাইকুমারী এবং আলাইকুড়ি সম্ভবত একই নদীর আলাদা আলাদা নাম।

মানাস নদীর তীরে এক সময় হারাগাছ বন্দর গড়ে উঠেছিল। দুশো বছর আগে বাংলাদেশের নদীর মানচিত্রই অন্যরকম ছিল। তিস্তা নদীর অন্যতম প্রবাহ ছিল মানাস নদী। এ নদীতে প্রচুর নৌকা চলত। জাহাজও চলত। এ নদীর তীরে জাহাজ ভিড়তো। শুধু তাই নয়, হারাগাছ বন্দরে ব্রিটিশরা জাহাজে করে আসত। তারাই বাংলাদেশে প্রথম তামাকের চাষ শুরু করে হারাগাছ এলাকায়। এ নদীটি এখনো রংপুর অঞ্চলের কল্যাণকামী একটি নদী।

বুড়াইল নামে তিনটি আলাদা নদী আছে। একটি রংপুর শহরের অদূরে উত্তর দিক ঘেঁষে প্রবাহিত। এ নদীর সাথে শহরের কেডিখাল। এর প্রস্থ এবং গভীরতা অনেক কম। এ নদীরপাড়ে বুড়াইলের হাট নামক একটি বাজারও আছে। আর একটি বুড়াইল নদী আছে কুড়িগ্রাম-রংপুর মহাসড়কের নব্দীগঞ্জ-মীরবাগ নামক স্থানের মাঝা-মাঝি। সেখানে বুড়াইলের ব্রিজ নামে একটি সেতুও আছে। মিঠাপুকুর উপজেলার কাফ্রিখাল এবং শালমারা নদী মিলিত হওয়ার পর প্রায়

২ কিলোমিটার প্রবাহিত প্রবাহটির নাম বুড়াইল। বুড়াইল নামক প্রায় ২০০ ফুট একটি সেতু আছে ওই নদীর ওপর। এ তিনটি নদীর যথেষ্ট প্রভাব আছে জনজীবনে। কৃষিকাজে এ তিনটি নদী সহায়ক। নদী তিনটি বর্ষার পানি বয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার কারণে ফসলের ক্ষতি সহজে হয় না।

রংপুর শহরের উত্তরের বুড়াইল নদীটি প্রায় ১২ কিলোমিটার প্রবাহিত হওয়ার পর রংপুর শহরের নিকটেই কুকরুল বিলের একটি অংশে মিলিত হয়েছে। এ নদীটি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। রংপুরের উত্তরে বর্ষায় যে পানি হয় তা এই নদী ধরে ভাটিতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। প্রথমে এ পানি পড়ে কুকরুলের বিলে। সেখান থেকে সিগারেট কোম্পানি নামক স্থানের কাছে কেডিখালে। কেডিখালের পানি রংপুর শহরের পূর্বদিকে সাতমাথা নামক স্থানের কাছে মিলিত হয় শ্যামাসুন্দরী নদীতে। শ্যামাসুন্দরী নদীর পানি মাহিগঞ্জের নিকটে মিলিত হয় খোকসা ঘাঘট নদে। খোকসা ঘাঘটের পানি নিয়ে নদীটি দমদমা নামক স্থানে মিলিত হয়েছে ঘাঘটে। ঘাঘট নদ এই পানি বহন করে নিয়ে যায় গাইবান্ধায় যমুনা নদীতে। এভাবেই রংপুরের উত্তর সংলগ্ন বুড়াইল নদীর পানি সমুদ্র পথে প্রবাহিত হয়।

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয়ে বুল্লাই নামের একটি নদী রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের ঘাঘট নদের সাত/আট কিলোমিটার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়। নদীটি বদরগঞ্জ এলাকায় খাঁড়ুভাঁজ নাম নিয়েছে।

যমুনেশ্বরী একটি মধ্যম আকৃতির নদী। এ নদী উজানে কয়েকটি নদীর পানি নিয়ে ভাটির দিকে মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ দিয়ে প্রবহিত। বুল্লাই নদী পার হয়ে এ নদীটি পাওয়া যাবে। এ নদী থেকে সৈয়দপুর যেতে সরু একটি নদী পাওয়া যাবে, যার নাম নেংটি ছেড়া। রংপুরের আদি শহর মাহিগঞ্জ। এ শহর গড়ে উঠেছিল ইছামতি নদীর পাড়ে। নদীটি সর্বশেষ অস্তিত্ব নিয়ে কোনো রকম নাম নিয়ে টিকে আছে।

সোনামতি, আখিরা, কাঠগরি, ভেলুয়া মিঠাপুকুরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নলশীসা, মরানলেয়া পীরগঞ্জ উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। খটখটিয়া, টেপরির বিল, শাখা চিকলি বড়রগঞ্জ উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত। এনদীগুলো আকৃতিতে ছোট হলেও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। 'নতুন তিস্তা' নদীটি ২০১৮ সালে নতুন করে তৈরি হয়েছে। রংপুরের গঙ্গাচড়ার মহিপুর সেতুর চার-পাঁচ কিলোমিটার উজানে বাঁধ ভেঙে নতুন তিস্তা প্রায় ১৫ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে আবারো তিস্তায় মিলিত হয়েছে। এই নতুন তিস্তা পুরাতন তিস্তার আন্তশাখা নদী।

রংপুরের নদ-নদীগুলো এ অঞ্চলের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, ভূমির গঠন সব কিছুর ওপর প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। মানুষের সংস্কৃতি-অর্থনীতিতেও এগুলোর প্রভাব অনস্বীকার্য। কালের বিবর্তনে নদীগুলোর অবস্থা করুণ হয়েছে।

অপরিচিত নদী বাইশাডারা

আমাদের দেশে অসংখ্য নদী আছে যেগুলো কখনোই নদী হিসেবে গ্রন্থগত হয়নি। না সরকারি কোন সংস্থায় না বেসরকারি কোনো সংস্থায়। এরকম একটি নদীর নাম বাইশাডারা।

রংপুর অঞ্চলের ডারা বলা হয় সাধারণত নদী যখন তার গতি-প্রকৃতি হারাতে হারাতে কোথাও কোথাও বিশাল প্রস্থ নিয়ে বেঁচে থাকে সেই অংশটিকে ডারা বলা হয়। হয়তো তার প্রবাহ থাকে অথবা থাকেনা। বাইশাডারা নদীরও সেই অবস্থা। তবে এখনো এর প্রবাহ বিদ্যমান। বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবাহ বজায় থাকে। শুষ্ক মৌসুমে অনেক স্থানে একেবারেই শুকিয়ে যায়। এক সময় এ নদীটি বারোমাসি নদী হিসেবেই প্রবাহিত হতো।

বাইশাডারা নদীটি তিস্তার আন্তশাখা নদী। অর্থাৎ এ নদীটি রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার তিস্তা থেকে বের হয়ে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার সাওলা ইউনিয়নের শিবদেব এলাকা দিয়ে তিস্তায় পতিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫-২০ কিলোমিটার। তিস্তার যে স্থানে এ নদীটি মিলিত হয়েছে সেখানে একটি স্লুইস গেট আছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে এ নদীতে নৌকা চলত। নৌপথে কাউনিয়া থেকে শাওলা হয়ে নৌকা চলত। মাত্র ৪০-৫০ বছরেই একটি বারোমসি নদী এখন মৌসুমী নদীতে পরিণত হয়েছে। পীরগাছা উপজেলার সাওলা ইউনিয়েনের তাসতালুক মৌজার আব্দুর রাজ্জাক জানালেন–উজানে এ নদীটি তুলসিডাঙা নামে পরিচিত। এ নদীতে নৌকাবাইচ হতো।'

করুণ মৃত্যুর পথে শালমারা নদী

রংপুর শহর থেকে ৭-৮ কিলোমিটার দূরে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের বৈরাগীগঞ্জ নামক স্থানের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে শালমারা নদী। সর্পিলাকৃতি নিয়ে এগিয়ে গেছে। চৈত্র মাসেও অনেক স্থানে নদীটিতে পানি দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ নদীরপানি মেশিন দিয়ে তুলে ধানও চাষ করছেন। নদীর বুক জুড়ে ধান চাষও রয়েছে। এ নদীর নামে শালমারা হাট আছে। হাটের পাশেই একটি সেতু। দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেক পুরোনো সেতু। স্থানীয়রা বলছেন ১৯৬০-৬৫ সালের সেতু এটি। তারও আগে এখানে আরও একটি সেতু ছিল। সেতুর আকৃতি বলে দেয় নদীর আকৃতি কেমন ছিল।

নদীটি রংপুরের বৈরাগীগঞ্জের নিম্ন এলাকা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মিলেছে কাফ্রিখাল নদীর সাথে। এরপর বুড়াইল নাম নিয়ে ঘাঘটের সাথে মিলিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ কিলোমিটার। নদীটির ভাটিতে কিছু অংশ ভরাট হয়েছে। সেগুলো দখলদারদের কাছে। দুপারেও প্রায় সর্বত্রই দখল আছে। শালমারাহাটের প্রায় সমস্ত ময়লা নদীতে ফেলে নদীটিকে দূষিত করা হচ্ছে।

শ্যামাসুন্দরী নদী শহরের প্রাণরেখা

বাংলাদেশ সরকার যখন দেশের সব নদীর প্রাণ প্রবাহ ফেরানোর কাজে মনোযোগী হয়েছে তখনো রংপুর শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা শ্যামাসুন্দরী নদী নিয়ে আমাদের ভাবতে হয়, এ নদী মরে যাবে নাকি বাঁচবে? নদীর প্রতি মানুষ কতটা নির্মম আর অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে শ্যামাসুন্দরীর প্রতি না তাকালে বলা কঠিন।

রংপুর শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে শ্যামা সুন্দরী। এ নদীটি ঘাঘট নদের শাখা নদী এবং খোকসা ঘাঘট নদের উপনদী। আজ থেকে মাত্র ২০ বছর আগেও এ নদীর পানি ছিল স্বচ্ছ। মাছ ধরে খেতেন অনেকেই। অনেক প্রবীণই জানিয়েছেন তারা এ নদীতে নৌকা চলতে দেখেছেন। একজন প্রবীণ এ কথাও জানিয়েছেন এক সময় এ নদীর পানিপান করা হতো। সারাদিন এ নদীতে শিশু-কিশোররা সাঁতার কাটত। কুড়ি বছর আগের এ নদীর সাথে বর্তমান এ নদীর তুলনা করলে আগের নদীর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কুড়ি বছর আগে জলের প্রকৃত রংটাই ছিল। এখন জলের রং আর নেই। কালো কুচকুচে। নোংরা। কুড়ি বছর আগে এ নদীর পাশে মানুষের একটুখানি দাঁড়াতে ইচ্ছে করত। আর আজ এ নদীর জলের দুর্গন্ধে দাঁড়ানো যায় না। নাকের সামান্য অনুভূতিও যাদের আছে তারা নদী এলাকা পার হওয়ার সময় নাকে হাত দিয়ে পার হন। যারা এ নদীকে ৫০-৬০ বছর থেকে দেখে আসছেন তাদের ভাষ্যে নদীর যে প্রস্থগত আকৃতির খবর পাওয়া যায় এখন আর সেই অবস্থা নেই।

প্রশ্ন হলো কেন হচ্ছে এই অবস্থা? এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কি কোনো উপায় নেই? প্রথমেই আসা যাক নদীতে পানির প্রকৃত রঙের প্রবাহ ফেরানো যাবে কিনা সে বিষয়ে। এ নদীর যে পানি তা আসে বৃষ্টি থেকে, ঘাঘট নদ থেকে। বৃষ্টির পানিও নোংরা নয়, ঘাঘটের পানিও নোংরা নয়। তাহলে প্রথমেই আমাদের নোংরা পানি যাতে শ্যামাসুন্দরীতে না আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। নোংরা পানি পড়া বন্ধ করতে নগরবাসী এবং সিটি কর্পোরেশনকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাংলাদেশের মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন দেশের সব নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছে। সেই রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলতে হয়, জীবন্ত শ্যামাসুন্দরীর উপর সকল দূষিত ও নোংরা পানি ফেলা বন্ধ করা একান্ত জরুরি। শুধু যে দূষিত পানি ফেলা হচ্ছে তা নয়। শহরের বর্জ্য ফেলার জন্যেও অনেকেই এ নদীকেই বেছে নিয়েছেন। নদী তীরবর্তীদের কাছে যেন এটা নদী নয়, ভাগাড়। এ বছর ২০১৯ সালের চলমান বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। এত বৃষ্টিপাতেও অনেক স্থানে শক্ত আবর্জনা ভাসিয়ে নিতে পারেনি। কোথাও কোথাও আবর্জনা জমাট বেঁধে পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করছে। এসব আবর্জনা ফেলাও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি আজঅব্দি।

এখন আসা যাক নদীর প্রস্থ প্রসঙ্গে। নদীর প্রস্থ কখনো কমে না। দৃশ্যমান নদীকে যে কেউ ভরাট করতে পারে, দখল করতে পারে। সরকারি অসৎ কর্মচারী আর অসাধু ব্যক্তি মিলে অবৈধ কাগজপত্র তৈরি হতে পারে। তার উপর অট্টালিকাও গড়ে উঠতে পারে। তাই বলে নদীর যে প্রস্থ ১৯৪০ সালের মানচিত্রে চিহ্নিত হয়েছে তা তো আর ক্ষয়ে যায়নি। সেই প্রস্থরেখা আজঅব্দি বহাল আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিচ্ছেন নদী রক্ষার জন্য তাহলে শহরের প্রাণ এ নদীটি আমরা কেন রক্ষা করতে পারব না ? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত কয়েক বছরে অনেকবার নদীকে বাধাহীন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ এবং হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে রংপুর শহরের প্রাণ বলে পরিচিত শ্যামাসুন্দরীর প্রকৃত ধারা ও প্রকৃত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শ্যামাসুন্দরী খননের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তারা এখন পর্যন্ত শ্যামাসুন্দরী নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে পারেনি। সীমানা চিহ্নিত না করে নদী খনন করতে গেলে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে নদী বাঁচানো যাবেনা। শ্যামাসুন্দরী খনন করতে হবে ১৯৪০ সালের নদীর প্রস্থ অনুযায়ী। এতে করে নদীর প্রকৃত প্রস্থ পাওয়া যাবে। নদীর প্রকৃত প্রস্থ পাওয়া গেলে আশাকরি একটি স্বাস্থ্যবান নদীই আমরা পাবো।

বর্তমানে শ্যামাসন্দুরীর যে করুণ অবস্থা তাতে নদীর বেঁচে থাকা কঠিন। বলা যায় শ্যামাসুন্দরী এখন মৃত্যু পথযাত্রী। শ্যামাসুন্দরীকে বাঁচাতে না পারলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদের অভিসম্পাৎ ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার থাকবে না। রংপুরের উত্তর প্রজেন্মর সুস্থ জীবন যাপনের জন্য এ নদীকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো বিকল্প নেই। এ নদীটি প্রকৃত রূপে ফেরানো গেলে রংপুর শহর হয়ে উঠবে একটি আদর্শ শহর। এ নদীকে কেন্দ্র করে শহরের সৌন্দর্যই পাল্টে যাবে। মানুষের কাছে এ নদী হয়ে উঠবে এক প্রাণের প্রবাহ। বর্তমান এ নদীটি আরও দুটি নদীকে দূষিত করার জন্য দায়ী। শহরের সাতমাথা নামক স্থানে খোকসা ঘাঘট নামের নদীতে শ্যামাসুন্দরীর ময়লা-দূষিত পানি বহন করে নিয়ে ফেলে। সেই পানি আবার রংপুরের অদূরে ঘাঘট নদে গিয়ে পতিত হয়। শ্যামাসন্দুরী রক্ষা পাওয়ার মানে হচ্ছে খোকসা ঘাঘট এবং ঘাঘট নদীও রক্ষা পাওয়া। উল্লেখ্য, শ্যামাসুন্দরী নদীকে অনেকেই খাল বলেন। মূলত ১৮৯০ সালে জানকী বল্লভ সেন এ নদীটি পুনরায় খনন করেন এবং তার মায়ের নামে নাম করণ করেন। খাল বলে পরিচিত হলেও এটি একটি নদী।

ঘাঘটের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ

আমাদের দেশে অনেক কারণেই নদীগুলো তার স্বাভাবিক প্রবাহ হারাচ্ছে। কখনো দীর্ঘদিন অযত্নে নদীর তলদেশ ভরাট হচ্ছে। কখনো নদী দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করার কারণে নদী মারা যাচ্ছে। নদীতে পানি আসার পথ বন্ধ করেও অনেক নদীর সর্বনাশ করা হচ্ছে। এরকম প্রভৃতি কারণে নদীগুলোর প্রাণ ওষ্ঠাগত।

নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার কইমারীর পাশ দিয়ে তিস্তা থেকে এই নদী প্রবহিত হতো। কিন্তু তিস্তা নদী তার স্থান পরিবর্তন করে অনেকটা পশ্চিমে সরে আসার কারণে ঘাঘট নদীর খানিকটা অংশ গ্রাস করে নিয়েছে। নদীটির যে স্থান থেকে ঘাঘট নদী বের হয়ে রংপুরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে সেই স্থানের পাশে অনেকটা এলাকা সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। পূর্বের নদীপথ এখন দখলদাররা ভোগ করছে। স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ঘাঘটের পুরোনো প্রবাহ সম্পর্কে জানেন। নতুন প্রজন্ম এসব জানেন না কিছুই।

ঘাঘট নদীর পাশেই আরেকটি নদী এসে তিস্তায় মিলিত হতো। সেই নদীর নাম আউলিয়াখান। আউলিয়াখান এবং ঘাঘটের মুখ প্রায় এক সাথেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী প্রায় ৪০-৪২ বছর আগে এ নদী দুটির মুখ বন্ধ করা হয়েছে। আউলিয়াখান নদীর মিলিত হওয়ার স্থানটি বন্ধ করে দেওয়ার কারণে এ নদীর পানি আর তিস্তার সাথে মিলতে পারছিল না। আউলিয়াখানের পানি তিস্তায় প্রবেশ করতে না পারায় ভয়াবহ বন্যা দেখা দিচ্ছিল। অন্য দিকে ঘাঘটের পানিও কমে এসেছিল। তখন আউলিয়াখান থেকে শুরু করে ঘাঘটের পুরোনো উৎস মুখের সন্নিকটে ঘাঘটের সাথে সংযোগকারী একটি খাল খনন করা হয়েছিল। এই খালটি আউলিয়াখান এবং ঘাঘটের সংযোগ খাল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তিস্তার পানিতে ঘাঘটে যে রকম সারা বছর পানি থাকতো, আউলিয়াখান নদীর পানিতে ঘাঘটে আর সেই পরিমাণ পানি আসেনা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নদী রক্ষা বা ফসল রক্ষা বাঁধ যখন নির্মাণ করেছে তখনি আউলিয়াখান এবং ঘাঘটের মুখ বন্ধ করা হয়েছে। আউলিয়াখান নদী উজান থেকে এসে মিশেছে। ফলে এ নদীর পানির অভাব হয়নি। শুধু মিলিত হওয়ার নদীটি আলাদা হয়েছে। আগে মিলিত হতো তিস্তার সাথে এখন মিলিত হয় ঘাঘটের সাথে। যেহেতু তিস্তার পানি ছিল ঘাঘটের প্রাণ তাই ঘাঘটের মুখ বন্ধ করায় নদীর চরম সর্বনাশ এর পথ রচিত হয়েছে।

নদীটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের তালিকাভুক্ত ৪০৫টি নদীর একটি। সরকারিভাবে এ নদীর পরিচিতি নম্বর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-৩৫। সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটির সূত্রমতে ঘাঘট নদীর দৈর্ঘ্য ১৯২ কিলোমিটার। প্রস্থ স্থান বিশেষে কোথাও ২০ মিটার কোথাও ১০০মিটার। এই নদীটির মুখ বন্ধ করে দেওয়ার কারণে দীর্ঘ ১৯২ কিলোমিটার নদীতে আর আগের মতো পানি থাকে না। পানির প্রবাহ না থাকার কারণে নদীটির গভীরতাও অনেক কমে আসছে। বারোমাসি এ নদীটি মৌসুমী নদীতে পরিণত হচ্ছে। এ নদীটির একটি শাখা নদীর নাম আলাই। মূলনদীতে পানি থাকে না বলে শাখা নদী আলাই নদীও পর্যাপ্ত পানি পাচ্ছে না। শুধু বর্ষার পানি এখন এ নদীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একই ভাবে রংপুর শহরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া শ্যামাসুন্দরী নদীটিও ঘাঘটের শাখা নদী। ঘাঘটের উৎস মুখ বন্ধ হওয়ার কারণে শ্যামাসুন্দরী নদীর পানির প্রবাহ কমে এসেছে অনেকটাই। ঘাঘটের পূর্বের জৌলুশ হারানোর অনেকগুলো কারণ আছে। এটি একটি তার মধ্যে অন্যতম।

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার তুলশিরহাট নামক একটি স্থানে ঘাঘট নদীর উপর একটি ব্রিজ আছে। ব্রিজের পাশে অনেক জেলের সাথে কথা হয়। স্থানীয় প্রবীণদের সাথে কথা বলে জানা যায় ৪০ বছর আগে এ নদীটি প্রস্থে অনেক বড় ছিল। এখন যেটুকু নদী আছে তার চেয়ে কয়েকগুণ প্রস্থে বেশি ছিল এ নদীটি। নদীর অনেক জমি এখন দখলদারদের হাতে। জেলেরাও বলছিলেন পূর্বে এ নদীতে অনেক পদের মাছ পাওয়া যেত। এখন আর আগের মতো মাছ পাওয়া যায় না।

এখন সময় এসেছে এ নদীর উৎস মুখ খুলে দেওয়ার। নদীর মুখ বন্ধ করে দিয়ে নদী মেরে ফেলা যাবে না। ভুল করে কিংবা জেনে শুনে এ নদীর মুখ বন্ধ করা হলেও এখন এ নদীর উৎসমুখ খুলে দিতে হবে। এ নদীর পানির উৎস মুখ খুলে দেওয়া হলে ঘাঘট, শ্যামাসুন্দরী এবং আলাই নদীতে পানির প্রবাহ বেড়ে যাবে। বর্ষায় যখন তিস্তায় প্রবল স্রোত নেমে আসে তখন শাখা নদী ঘাঘটের মাধ্যমেও পানির চাপ কমানো যাবে। সর্বোপরি একটি কথা আমাদের মানতে হবে– প্রকৃতিকে তার নিজের মতো থাকতে না দেওয়া হয় তাহলে তা বিরূপ আচরণ করবে। প্রকৃতির বিরূপ আচরণ মানেই তা মানুষের জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই যত তাড়াতাড়ি ঘাঘটের উৎস মুখ খুলে দেওয়া যাবে ততই মঙ্গল।

তিস্তা নদীর শতভাগ জলশূন্য হয়ে পড়ার দৃশ্য আগে কেউ কখনোই দেখেনি। তিনশ ১৫ কিলোমিটার নদীর মধ্যে ভারতের অংশে দুশো কিলোমিটার এর বুকে থই থই জল। আর বাংলাদেশ অংশে ধুধু বালুচর। নভেম্বর মাস থেকেই শুরু হয় এই জলশূন্যতা।

তিস্তায় পানি না থাকার কারণে কী পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে, তা শুধু অর্থমূল্যে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ তিস্তাকে বলা হয় উত্তরের জীবন-রেখা। সেই তিস্তাকে যদি বাঁচানো না যায় তাহলে উত্তরাঞ্চলকে বাঁচানোই কঠিন হবে। রংপুর বিভাগে প্রায় চার কোটি মানুষের খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হয়। এই উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তিস্তা নদীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। যদি তিস্তায় পানির প্রবাহ স্বাভাবিক থাকত তাহলে তিস্তা সেচ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করা যেত। তখন প্রায় দু লাখ হেক্টর জমিতে তিস্তার পানিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হতো। তিস্তায় পানি না থাকার কারণে গত দু বছর ভীষণ বিপাকে পড়তে হয়েছে তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষকগণকে।

তিস্তায় পানি না থাকলে সঙ্গত কারণেই তিস্তা তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পানির স্তর নিচে নেমে যায়। তখন গভীর নলকূপের মাধ্যমে আরও গভীর থেকে পানি উত্তোলন করে সেচ কাজ সম্পাদন করা হয়। এতে করে পানির স্তর আরও নিচে নেমে যায়। পানির স্তর বেশি পরিমাণ নিচে নেমে গেলে ভূমির উপরের অংশের সজীবতা কমে যায়। প্রকৃতির জন্য এই বাস্তবতা কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে তা নিয়েও গবেষণা হওয়া খুবই জরুরী।

যখন রংপুর অঞ্চল মঙ্গার অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল ঠিক সেই সময়ে তিস্তা সেচ প্রকল্প মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলের মানুষদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। গত দু বছরে তিস্তায় যে হাহাকার তৈরি হয়েছে তাতে করে সেই সুবিধা এখন শুধুই অতীত। তিস্তার পানি ফেরাতে ব্যর্থ হলে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী আবারও অভাবী জনপদে পরিণত হতে পারে।

তিস্তাকে বাঁচাতে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা জরুরী। সেই সাথে তিস্তা খনন করাও প্রয়োজন। তিস্তা খনন করা হলে বন্যা মৌসুমে সামান্য বৃষ্টিতেই যে ভাঙন আর বন্যা দেখা দেয় তা হবে না। নিয়মিত খনন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখাও প্রয়োজন। যে তিস্তা জলদুগ্ধ দিয়ে উত্তর জনপদে প্রাণের সঞ্চার করে, সেই তিস্তার আজ মরণাপন্ন অবস্থা। তিস্তাকে বাঁচাতে দল-মত নির্বিশেষে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

রংপুর জেলায় যে ২৯টি নদী আছে এ বিষয়গুলো অনেকের জানারও বাইরে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিজের দেশের, নিজের জেলার, উপজেলার নদ-নদীর নাম আমরা জানবো না তা ভালো দেখায় না।

জেলা এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিও বিষয়টি আমলে নিয়ে সরকারি নদীর তালিকাভুক্ত করতে পারে। সরকারি তালিকাভুক্তিতে এ নদীগুলোর নাম থাকলে নদীগুলো রাষ্ট্রীয় পরিচর্যা পাবে। অন্যথায়, যে গতিতে নদীগুলোর অবনমন হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে এই সংখ্যা ইতিহাসে থাকবে। বাস্তবে থাকবে না। আর এর পরিণতিও ভালো হবে না।

হাইকোর্ট নদী রক্ষায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অভিভাবক ঘোষণা করেছেন। সেই বিবেচনায় এখন এ নদীগুলোর প্রকৃত যত্ন করার প্রধান দায়িত্ব জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এখন চাইলে সারাদেশের নদীর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা উল্লেখ করতে পারবে। ইতোঃপূর্বে বাংলাদেশে একক কোন সংস্থা ছিল না যা নদীর অভিভাবকত্ব দাবি করতে পারে। যারা নদী নিয়ে ভাবেন, তাদের মধ্যে যে আশার সঞ্চার হয়েছে তা আশা করি জাতীয় নদী রক্ষা বাস্তবায়ন করবে।

সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

উত্তরের ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ জনপদ রংপুর মহানগরীর নিরাপত্তার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত সুভ্যেনিরে আমার জীবনের নানা দিক, খেলোয়াড় জীবন, অনুষঙ্গ, সংগ্রাম এবং আমার জীবন বোধ ও জীবন দর্শন সম্পর্কিত একটি লেখা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এজন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। লেখাটি পড়ে যদি প্রিয় পাঠক ও ভক্তকুল দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে পরিপালন করে, সেটিই হবে লেখাটির সার্থকতা। বর্ষপূর্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ তাদের উপর অর্পিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করে জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মাশরাফি বিন মর্তুজা)
সংসদ সদস্য, নড়াইল-২
অধিনায়ক
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল

মাশরাফি- এক অদম্য লড়াকু দেশপ্রেমিকের নাম

এ যেন এক অপ্রতিরোধ্য বীর সেনার গল্প। যার জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে সাহসিকতা, দেশপ্রেম আর অদম্য এক যোদ্ধার প্রতিচ্ছবি। মাশরাফি- নামটি লক্ষ্য কোটি ভক্তের কাছে একটি আবেগের নাম। হাজার হাজার তরুণ ও যুবকের নিকট অফুরন্ত প্রেরণার নাম। মাশরাফি তার দেড় যুগের ইনজুরিপ্রবণ ক্যারিয়ারে লক্ষ কোটি ভক্তকে আবেগে ভাসিয়েছেন, বিজয়োলাসে মাতিয়েছেন আবার কখনো বা আশাহত করিয়েছেন। তিনি পুরোদেশের ক্রিকেট ভক্তের চাওয়া পাওয়া ও আকাঙ্খাকে এক সুতোয় গেঁথে স্বপ্নে বিভোর করেছেন। মাশরাফি এমন একজন ক্রিকেটার যিনি দেশের আপামর জনসাধারণের বিরল অকৃত্রিম ভালোবাসা ও প্রার্থনায় সিক্ত হয়েছেন। তিনি ক্রিকেটার সত্ত্বাকে ছাপিয়ে একজন মানুষ মাশরাফি ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত দলনেতায় পরিণত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হোসাইন বলেছেন- নেতা, মানুষ আর খেলোয়াড় এই ৩ টি শব্দ যোগ করলে মাশরাফির মতো কোন ক্রিকেটার এর আগে ক্রিকেট বিশ্ব আর কাউকে দেখেনি।

ওয়ানডে, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির ১৬ বছরে দুই হাঁটু মিলিয়ে ৭ বার অপারেশন, দুই অ্যাংকেল মিলিয়ে ১০ বার ডাক্তারের ছুরির নিচে নিজেকে সপেঁ দিয়েছেন। প্রতি ম্যাচ শেষে সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে বের করতে হয় হাঁটুতে জমা বিষাক্ত রস। ঘুম থেকে উঠে সাথে সাথে নামতে পারেন না বিছানা থেকে। হাঁটু দুটি কয়েকবার ভাঁজ ও সোজা করতে হয়। তারপরেই শুরু হয় দিন। ডাক্তাররা বলেছেন এভাবে ক্রিকেট চালিয়ে গেলে এক সময়ে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাবেন। কিন্তু দমে যাননি, সব শঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে নেমে পড়েন বল হাতে। বাঘের মতো ক্ষীপ্র গতিতে ছুটে চলেন তিনি।

প্রতিবার মাশরাফি ইনজুরির সাথে লড়াই করে ফেরেন, আর তার ডাক্তার অস্ট্রেলিয়ান ডেভিড ইয়াং চোখ কপালে তুলে বলেন, "এ-ও কি সম্ভব!" এ ধরনের একটা ইনজুরিই তো শেষ করে দিতে পারে একজন ফাস্ট বোলারের ক্যারিয়ার! সেখানে মাশরাফির বারবার লড়াই করে ফিরে আসার রহস্য কী? উত্তরটা দিয়েছিলেন মাশরাফি নিজেই। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বারবার ইনজুরি থেকে ফিরে আসার প্রেরণাও পাই সেসব বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকেই। এমনও ম্যাচ গেছে আমি হয়তো চোটের কারণে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। দুই-তিনটা বল করেই বুঝতে পারছিলাম সমস্যা হচ্ছে। তখন তাঁদের স্মরণ করেছি। নিজেকে বলেছি, 'হাত-পায়ে গুলি লাগার পরও তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন কীভাবে? তোর তো একটা মাত্র লিগামেন্ট নেই! দৌড়া।

শত ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে লাল সবুজ পতাকার সম্মান, হাসি-কান্নার ভার যার কাঁধে, ম্যাচ হারলে যিনি কাঁদেন নিরব সবার আড়ালে। যাতে তরুণ ক্রিকেটাররা হতাশ না হয়। নবীন ক্রিকেটারদের বুকের মধ্যে আগলে রাখেন ভালোবাসা দিয়ে বটবৃক্ষের মতো। কখনও কপালে চুমু দেন, ভালোবেসে মাথার চুল এলোমেলো করে দেন। ভক্তগোষ্ঠী মাঠে ঢুকে পড়লেও বুকে আশ্রয় দেন পরম মমতায়। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জীবন্ত কিংবদন্তী, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো টাইগার ক্রিকেটের সোনালী দিনের বংশীবাদক এবং সর্বকালের সেরা অধিনায়ক লড়াকু মাশরাফি বিন মর্তুজা। পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়েও যিনি বল করে যান। তিনি এমন একজন মহানায়ক, যিনি দলকে নেতৃত্ব দেন সামনে থেকে। নিজের কষ্ট, ব্যথা নিজের মধ্যে রেখে লড়ে যান দেশের জন্য ক্রিকেট যুদ্ধে। ৫ই অক্টোবর ১৯৮৩ সালে নড়াইল জেলায় গোলাম মর্তুজা ও হামিদা রহমান বলার ঘর আলোকিত করে জন্ম নেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের অন্যতম বোলিং স্তম্ভ মাশরাফি বিন মর্তুজা। বাংলাদেশ জাতীয় দল ছাড়া এশিয়া একাদশে একদিনের আন্তর্জাতিক দলে খেলেছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বাকালের সেরা অধিনায়ক তিনি। বাংলাদেশ ক্রিকেটের সেরা আবিষ্কার তিনি।

তাঁর হাত ধরেই ক্রিকেটের সোনালী সময় পার করছে বাংলাদেশ। মাশরাফিই বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার, যিনি কোনো লিস্ট-এ ম্যাচ না খেলেই সরাসরি জাতীয় দলের মূল দলে জায়গা পেয়েছেন। ২০১৫ বিশ্বকাপে দলকে নিয়ে গিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনালে। সেরা সাফল্য আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সেমি-ফাইনাল। তার হাত ধরেই পাকিস্তানকে হোয়াইট ওয়াশ; ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, উইন্ডিজদের সাথে সিরিজ জয় করেছে। তিনি জাতীয় দলে প্রবেশ করেন টেস্ট ক্রিকেটের মাধ্যমে। ৮ই নভেম্বর, ২০০১ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অভিষেক হয় টেস্টে। ইনজুরির বিষাক্ত ছোবলে টেস্ট ক্যারিয়ার দীর্ঘ করতে পারেননি। ২০০৯ সালে উইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ইনজুরি হয়ে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানান। ৩৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলে দুটি অর্ধ-শত সহ ৭৯৭ রান নেন। ৭৮ টি উইকেট নেন, ক্যারিয়ার সেরা ফিগার ৬০ রানে ৪ উইকেট।

২৩শে নভেম্বর ২০০১ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অভিষেক হয় ওডিআইতে। এখনো দারুণ দক্ষতার সাথে খেলে যাচ্ছেন অভিজ্ঞ এই মহানায়ক। এই পর্যন্ত তিনি ২০৯ টি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ম্যাচ খেলে ১ টি অর্ধ-শত সহ ১,৭৫২ রান এবং ২৬৫ টি উইকেট নিয়েছেন। সেরা বোলিং ফিগার ২৬ রানে ৬ উইকেট। টি-টুয়েন্টিতেও এই জিম্বাবুয়ের সাথে ২০০৬ সালের নভেম্বরে অভিষেক ঘটে। টেস্টের মতো টি-টোয়েন্টিকেও বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন এই মহা তারকা ২০১৭ সালের ৬ এপ্রিল শ্রীলংকার সাথে ম্যাচ খেলে। ৫৪ টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ৩৭৭ রান এবং ৪২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। সেরা বোলিং ফিগার ১৯ রানে ৪ উইকেট। ক্রিকেট জীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখ চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইনজুরির জন্য ঘরের মাঠে ২০১১ সালের বিশ্বকাপ খেলতে না পারা। এছাড়া সোনায় মোড়ানো মাশরাফির ক্রিকেটীয় জীবন।

মাশরাফির জীবন কাহিনীই যেন একটা শ্বাসরূদ্ধকর উপন্যাস। সেই উপন্যাসই একটি গ্রন্থে, একজায়গায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় লেখা হয়েছে তার জীবনীগ্রন্থ, 'মাশরাফি'। ক্রীড়া সাংবাদিক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় রচিত মাশরাফির এই

জীবনীগ্রন্থটি ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলেছে। সেই বইতেই নানা জায়গায় উঠে এসেছে মাশরাফির জীবনবোধ, জীবন দর্শন ও দেশত্ববোধ নিয়ে অনেক মূল্যবান চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি। অনেক রাশভারি কথা-বার্তা। মাশরাফির বইয়ের একটি অধ্যায়, বলছেন মাশরাফি। এই অধ্যায়েরই লেখকের সঙ্গে মাশরাফির জীবনবোধ এবং দেশপ্রেম নিয়ে কিছু কথোপকথন তুলে ধরা হলো এখানে-

খেলোয়াড় জীবন আসলে কেমন? মাশরাফি বলেন, *আমাদের এই উপমহাদেশে খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্সই তার জীবনের মাপকাঠি। এটা একটু অদ্ভূত। ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশে বোধ হয় এটা হয়। শ্রীলঙ্কাতে তেমন হয় না। এখানে একটা খেলোয়াড় মানে, চব্বিশ ঘণ্টাই ওই পারফরম্যান্সের কারণে বিচার হচ্ছে তার। খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবনটাও খেলা দিয়ে মাপা হয়। এটা আসলে খেলা-ধুলার মূল সুরের সঙ্গে ঠিক যায় না। আপনি যদি অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের দিকে তাকান, ওরা খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স দিয়ে তাকে মাঠে বিচার করে। সেই অনুযায়ী তাকে দলে রাখা হবে বা বাদ দেওয়া হবে। আমাদের কী হয়? একটা ছেলে রান না পেলে তার পরিবার জ্বালা টের পায়। তার পুরো জীবনটা প্রভাবিত হয়। কেন হয়? এর একটা বড় কারণ, ক্রিকেট অনুসরণ না করা। আমাদের এখানে জয়ের আনন্দে বা জয় দেখতে চেয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন সমর্থক যোগ হচ্ছেন। আমি সমালোচনা করছি না। তবে এই ক্রিকেটের আগে-পরের চরিত্র, ক্রিকেটে কী ঘটে, কী ঘটে না; এসব একেবারেই না জেনে ক্রিকেটের অনুসরণকারী হয়ে যাওয়ার বিপদ আছে। মনে হয় ব্যর্থতাটা বুঝি খেলার অংশ না। এর ফলে ব্যর্থতা মানেই সেটাকে ব্যক্তিগত অন্যায় ভেবে বসা হয়। এটার খুব বিপদ আছে। এটাতো আপনারা ভালো খেলছেন, পাচ্ছেন; তাই জয়ের নেশাটা বাড়তে থাকে। এটাই আমি ভয়ের জায়গা মনে করি। জয় তো চাইবেই। কোনো খেলোয়াড় মাঠে হারার পরিকল্পনা করে নামে না। কিন্তু জয়টা যেন খেলার চেয়ে জরুরী হয়ে যাচ্ছে। এই লোভটা খারাপ। আমরা লোভি হয়ে যাচ্ছি। এই যে কথায় কথায় 'বাংলাওয়াশ' বলা হয়, এর মধ্যে এক ধরনের অন্যের প্রতি ঘৃণা আর নিজেদের লোভের প্রকাশ আছে। এই শব্দটাই ভালো না। আপনি কেন 'ওয়াশ' করার লক্ষ্য নিয়ে খেলবেন? আপনি বেস্ট ক্রিকেট এনজয় করার লক্ষ্য নিয়ে খেলবেন। খেলার চেয়ে এই লোভ বড় হয়ে গেলে অনেক বিপদ আছে।*

আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেন, ক্রিকেট এখন দেশপ্রেম প্রকাশের একটা জায়গা হয়ে গেছে। আমি তো নিয়মিত বলছি কথাটা। দেশের তুলনায় ক্রিকেটটা অতি ক্ষুদ্র একটা ব্যাপার। একটা দেশের অনেক ছোট ছোট মাধ্যমের একটা হতে পারে খেলাধুলা; তার একটা অংশ ক্রিকেট। ক্রিকেট কখনও দেশপ্রেমের প্রতীক হতে পারে না। সোজা কথায় খেলাধুলা হলো বিনোদন। অথচ বিনোদনটা এখন দেশের প্রধান ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এটা তো বিস্ময়কর ব্যাপার। খেলা কখনও একটা দেশের প্রধান আলোচনায় পরিণত হতে পারে না। দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে যা সমাধান বাকি। সেখানে ক্রিকেট নিয়ে পুরো জাতি, রাষ্ট্র এভাবে এনগেজ হয়ে পড়তে পারে না। আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় তারকা বানানো হচ্ছে, বীর বলা হচ্ছে, মিথ তৈরি হচ্ছে। এগুলো সব হলো বাস্তবতা থেকে পালানোর ব্যাপার।

তাহলে তারকা কে? বীর কে? আমাদের দেশে তো তারকাও নেই বীরও নেই। *অবশ্যই আছে। আমাকে প্রশ্ন করুন, তারকা হলেন একজন ডাক্তার। আমি ক্রিকেটার, একটা জীবন কি বাঁচাতে পারি? কক্ষনো না। একজন ডাক্তার পারেন। কই, দেশের সবচেয়ে ভালো ডাক্তারের নামে কেউ তো একটা হাততালি দেয় না! তাদের নিয়ে মিথ তৈরি করান, তারা আরও পাঁচজনের জীবন বাঁচাবেন। তারাই তারকা। তারকা হলেন লেবাররা, দেশ গড়ে ফেলছে। ক্রিকেট দিয়ে আমরা কি বানাতে পারছি? একটা ইটও কি ক্রিকেট দিয়ে তৈরী করা যায়? একটা ধান জন্মায় ক্রিকেট মাঠে? জন্মায় না। যারা এই ইট দিয়ে দালান বানায়, যারা কারখানায় আমাদের জন্য এটা-ওটা বানায় বা ক্ষেতে ধান জন্মায়, তারকা হলেন তারা।*

বীর? আপনি বীর নিয়ে অন্য একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন? হ্যাঁ, *সব সময় বলি। বীর হলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আরে ভাই, তারা জীবন দিয়েছেন। জীবন যাবে জেনেই ফ্রন্টে গেছেন দেশের জন্য। আমরা কি করি? খুব বাজে ভাবে বলি- টাকা নেই, পারফর্ম করি। এটা অভিনেতা, গায়কের মতো আমরাও পারফর্মিং আর্ট করি। এর চেয়ে এক ইঞ্চি বেশিও কিছু না। মুক্তিযোদ্ধারা গুলির সামনে এইজন্য দাঁড়ায় নাই যে জিতলে টাকা পাবে। কাদের সঙ্গে কাদের তুলনা! ক্রিকেটে বীর কেউ থেকে থাকলে রকিবুল হাসান, শহীদ জুয়েলরা। ক্রিকেটার হিসেবে বললেন? নাহ। রকিবুল ভাই ব্যাটে জয় বাংলা লিখে খেলতে নেমেছিলেন, অনেক বড় কাজ। তার চেয়েও বড় কাজ, বাবার বন্দুক নিয়ে ফ্রন্টে চলে গিয়েছিলেন। শহীদ জুয়েল ক্রিকেট রেখে ক্র্যাক প্লাটুনে যোগ দিয়েছিলেন। এটাই হলো বীরত্ব। ফাস্ট বোলিং সামলানোর মধ্যে রোমান্টিসিজম আছে, ডিউটি আছে; বীরত্ব নেই।*

ক্রিকেটে দেশপ্রেম খোঁজে কেন? কেন খোঁজে? আমি বলি, এই যারা ক্রিকেটে দেশপ্রেম দেশপ্রেম বলে চিৎকার করে, এরা সবাই যদি একদিন রাস্তায় কলার খোসা ফেলা বন্ধ করত, একটা দিন রাস্তায় থুতু না ফেলত বা একটা দিন ট্রাফিক আইন মানত, দেশ বদলে যেত। এই প্রবল এনার্জি ক্রিকেটের পেছনে ব্যয় না করে নিজের কাজটা যদি সততার সঙ্গে একটা দিনও সবাই মানে, সেটাই হয় দেশপ্রেম দেখানো। আমি তো এই মানুষদের দেশপ্রেমের সংজ্ঞাটাই বুঝি না! যেমন? আরে সুমন ভাইরা (হাবিবুল বাশার) আইসিএল খেলতে গেল, তারা নাকি দেশদ্রোহী! বোঝেন অবস্থাটা। একটা বোর্ডের সঙ্গে গোলমাল করে একটা সংস্থা আইনের অধীনেই একটা লিগ চালু করেছে। যাদের বিপক্ষে সে দেশেও কোন অসৎ কাজের অভিযোগ নেই। সেখানে খেলতে গেলে আপনি প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলতে পারেন, কিসের দেশদ্রোহী! দেশপ্রেম, দেশদ্রোহ কোনটাই এত সোজা না।

আশরাফুল কী দেশদ্রোহী? এটা তো আমি জাজ করার কেউ না। ঠিক দেশের সঙ্গে প্রতারণা না হলেও মানুষের সঙ্গে প্রতারণা তো। তবে এগুলো অনেক বেশি ভেবে নেওয়ার ব্যাপার। আসলে দেশদ্রোহ কোনটা? আপনি রাষ্ট্রের একটা গোপন তথ্য পাচার করে দিলেন, রাষ্ট্রের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন, রাষ্ট্রকে সংকটে ফেলে দিলেন; এসব হলো দেশদ্রোহ। দেশদ্রোহ শব্দটা অনেক বড়। জাতীয়তাবাদকে খুব সস্তা করে ফেলেছি আমরা? একদম।

কিছু হলেই বলে, এই এগারো জন ১৬ কোটি মানুষের প্রতিনিধি। আন্দাজে! তিন কোটি লোকও হয়তো খেলা দেখে না। দেখলেও তাদের জীবন-মরণ খেলায় না। মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন রাজনীতিবিদেরা, তাদের স্বপ্ন ভবিষ্যত অন্য জায়গায়। এই এগারো জন পারফরমারের ওপর এই দেশের মানুষের ক্ষুধা, বেঁচে থাকা নির্ভর করে না। দেশের মানুষকে তাকিয়ে থাকতে হবে একজন শিক্ষাবিদের দিকে, একজন বিজ্ঞানীর দিকে।

আরেকটু পরিষ্কার করেন। ধরুন এমন একটা আবিষ্কার হবে, যেটা সারাজীবন থেকে যাবে। খেলায় পারফরম্যান্স আজ আছে, ভালো লাগছে। কাল যেই খারাপ হবে, ফুরিয়ে যাবে। আজ একজন বিজ্ঞানী বা গবেষক এমন কিছু একটা আবিষ্কার করবেন; যেটা বাংলাদেশের নাম ইতিহাসে লিখে দেবে। যুগের পর যুগ ছাত্ররা সেটা নিয়ে পড়বে। রাষ্ট্রকে এসব কাজে উৎসাহ দিতে হবে। ক্রিকেটকে তাহলে কী খুব গৌন মনে করছেন? জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র, দেশ- এগুলোর তুলনায় তুচ্ছ একটা ব্যাপার নয়? হ্যাঁ, এটা আমাদের পরিচিতির একটা সিম্বল হতে পারে। তারপরও কথা আছে। শুধু ক্রিকেট কেন? শুধু ক্রিকেট দিয়েই কী আমাদের খেলাধুলার মান যাচাই করা যাবে? আজকে আমরা যদি খেলাধুলার সব সেক্টরেই কিছু এগুতে পারতাম, আমাদের ফুটবল অন্তত এশিয়ান লেভেলে পৌঁছে যেত, একটা অলিম্পিক গোল্ড মেডেল থাকত। বৈশ্বিক খেলাধুলার বিচারে এগুলোর চেয়ে ক্রিকেট তো অনেক পেছনের একটা ব্যাপার। তবু একটা জায়গায় আমরা গেছি বলে মনে হতো।

মাশরাফি থাকবেন লক্ষ কোটি ভক্তের হৃদয়ে। মাশরাফি থাকবেন কোটি তরুণের অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে। হয়তো তিনি থাকবেন বোর্ডের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তি হয়ে, কিংবা কোচ বা অন্য কোনো দায়িত্ব নিয়ে। কিন্তু তার আরেকটি অনন্য জায়গা আছে, তিনি থাকবেন আমাদের হৃদয়ে। কারণ মাশরাফি ক্রিকেটটা শুধু ব্যাট বল দিয়ে খেলেন না, খেলেন হৃদয় দিয়ে। মাশরাফি শুধু একজন ক্রিকেটার নন, তিনি একজন অধিনায়ক, একজন দেশপ্রেমিক নেতা। কবি শামসুর রাহমানের ভাষায় বলা যায়, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়।

তথ্যসূত্র: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, মাশরাফি; পৃষ্ঠা: ১৩, ৩৯১, ৪৬৪
সংকলনে : মোঃ ফারুক আহমেদ, সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন), রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

রেজিঃ রাজ-১৯ | প্রকাশনার ৪৮ বছর | রংপুর | ১০৬ সংখ্যা | ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্বোধনের সময় বক্তব্য রাখেন (উপরে)। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনস্‌এ উপস্থিত সিটি মেয়রসহ অতিথিবৃন্দ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের যাত্রা শুরু

নিবিড় নিরাপত্তার প্রত্যাশা নগরবাসির

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ উদ্বোধন করায় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের মাসিক অপরাধ ও পর্যালোচনা সভায় ২০১৮ সালের শ্রেষ্ঠ এসআই হিসেবে মো: রফিকুল ইসলামকে ক্রেস্ট ও সনদ তুলেদেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জনাব আবদুল আলীম মাহমুদ। ছবি.. ....রিপন

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর উদ্বোধন উপলক্ষে গতকাল নগরীতে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়

শান্তিময় হবে রংপুর মহানগর

রংপুর অফিস ॥

নগরবাসী যেন নিরাপদে ঘুমাতে পারেন, চলাফেরা করতে পারেন সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে

‘E-trafficking prosecution system’ launched in Rangpur

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ৬ থানায় প্রথম দিনটি কেমন কেটেছে

এক মামলা, এক জিডি

রংপুরে ই-ট্রাফিক সেবা চালু

রংপুর অফিস ॥

পুলিশের সাথে জনগণের সম্পর্ক ভালো থাকলে দেশে অপরাধ কমবে-আরপিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে প্রসংশনীয় উদ্যোগ

রংপুর মেট্রো কোতয়ালী ও তাজহাট থানা কমিউনিটি পুলিশিং সভা

যানজট নিরসনে রংপুর মেট্রো পুলিশের কার্যক্রম চলছে

রংপুরে নাশকতার চেষ্টার অভিযোগে জামায়াতের মহানগর আমীরসহ গ্রেপ্তার-৬

● স্টাফ রিপোর্টার

রংপুরে নাশকতার চেষ্টার অভিযোগে মহানগর জামায়াতের ...

নিরাপদ নগরী উপহার দিতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চাইলেন আরপিএমপি কমিশনার

● স্টাফ রিপোর্টার

মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদমুক্ত নিরাপদ মহানগরী উপহার দিতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চেয়েছেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরপিএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবদুল আলীম মাহমুদ ...

মহানগরীতে ট্রাফিক দক্ষিণ ইউনিটের যাত্রা শুরু

● স্টাফ রিপোর্টার

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরপিএমপি) ট্রাফিক বিভাগে এবার নতুন সংযোজন ট্রাফিক দক্ষিণ ইউনিট। মঙ্গলবার আবারো চেয়ে নতুন কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছে এ ইউনিটটি।

রংপুর নগরীর ৩২ পয়েন্টে সিসি ক্যামেরা স্থাপন

● স্টাফ রিপোর্টার

ট্রাফিক ব্যবস্থা ও জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষে রংপুর নগরীর ৩২টি পয়েন্টে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে ও ব্যবস্থাপনায় এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের ...

০৪।০৬।১৯

রংপুরে শিশু অপহরণের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার করে সংবাদ সম্মেলন করেন আরপিএমপি পুলিশ কমিশনার মোহা: আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম। পাশে ইনসেটে গ্রেফতার হওয়া অপহরণকারীরা —প্রতিদিনের বাংলাদেশ

রংপুরে শিশু অপহরণের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার : গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রংপুর নগরীর আলমনগর ... উদ্ধার করেছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। গতকাল সোমবার আরপিএমপি ... বিপিএম ... বলেন, ...

... জামায়াতের আমীর কাউছার আলী (৪৩) ... লিমন (৪৬) এবং ... রহমান(৫৮) তাজুল ... ইয়াহিয়া মাহামুদ (...) হক(১৯)। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ... মুহাঃ আবদুল আলীম ... কোতয়ালি থানায় ... সাংবাদিকদের প্রেস ... এসময় পুলিশ ...

রংপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে দুই হাজার পিচ ইয়াবা উদ্ধার

বাংলার আলো

রংপুরে মোটরসাইকেল ছিনতাই চক্রের ৩ সদস্য গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার

১ম পৃষ্ঠার পর...

পেছনে নিয়ে মোটরসাইকেলটি চালিয়ে হাজীরহাট থানা মোড় রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কে পৌঁছে মামাকে ফোন দেয়ার কথা বলেন। এসময় আল-আমিন গাড়ি থেকে নেমে পড়েন

পুলিশের হাতে আটক অটোরিকশা ছিনতাইকারী চক্রের নারী সদস্য ...

রংপুরে অটোরিকশা ছিনতাইচক্রের নারী সদস্য আটক

বাংলার আলো

● স্টাফ রিপোর্টার

রংপুরে ভাড়াটিয়া চালককে অজ্ঞান করে অটোরিকশা ছিনতাইকারী চক্রের নারী সদস্য রুমি বেগমকে (২৬) আটক করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে মেডিক্যাল মোড় থেকে ... বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোতয়ালি থানার ... রোকনুজ্জামান। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাত ৯টার দিকে একজন অপরিচিত যুবক (৩২) ও একজন নারী (২৯) ...

...বা সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল এতিম শিশুদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন রংপুর মে... মোহাম্মদ আব্দুল আলীম মাহমুদ

নগরীতে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড উদ্বোধন

● স্টাফ রিপোর্টার বাংলার আলো

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের চিত্র প্রদর্শনের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার নগরীর জাহাজ কোম্পানির মোড়ে প্রধান অতিথি হিসেবে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড উদ্বোধন করেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবদুল আলীম মাহমুদ।

সুমি গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব তানবীর হোসেন আশরাফীর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রেসিডেন্ট মোস্তফা সোহরাব চৌধুরী টিটো, রংপুর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রেসিডেন্ট রেজাউল ইসলাম মিলন, মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি সাফিয়ার রহমান শফি, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক তৌহিদুর রহমান ..., রংপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান সিদ্দিকী ...

রংপুরে পুলিশের অভিযানে ১৫৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার ৪

স্টাফ রিপোর্টার

রংপুরে মাদক বিরোধী অভিযানে ফেন্সিডিলসহ চার যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নগরীর ... ১৫৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। ...

ব্যারিস্টার মইনুলের জামিন নামঞ্জুর

আদালত চত্বরে আওয়ামীলীগ বিএনপি ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

রংপুরে অটোরিক্সার দোকান থেকে চুরি হওয়া ২৮টি ব্যাটারী উদ্ধার : গ্রেফতার ৩

রংপুরে শিল্প ও কর্মসংস্থান সমস্যা ও সম্ভাবনা

মো: রাকিবুল হাসান রাকিব •

শুরুতেই একটু নজর দেয়া যাক বর্তমান সরকার আমাদের দীর্ঘস্থায়ী উন্নতির জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সেই দিকে! এসডিজির নবম লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে '' দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরী, অর্ন্তভূক্তিমুলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা ও উদ্ভাবন উৎসাহিত করা''

২০১৭-২০১৮ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ৩৩.৭১ শতাংশ। তাহলে আমরা দেখছি শিল্পায়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা একটি কার্যকরী মাধ্যম। শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যবসায়ীক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেরও একটি অপার সম্ভাবনা তৈরী হয়। রংপুর বিভাগ শিল্পে অনেক পিছিয়ে আছে। এই অঞ্চলে বৃহৎ শিল্প খুব একটা নেই: **রংপুর :** পুর্বের শ্যামপুর সুগারমিল, বর্তমানে আরএফএল, কারুপণ্য লি:, সনিক-প্রাইম, এবং বিসিক শিল্পনগরী। **দিনাজপুর:** সেতাবগঞ্জ সুগার মিল ও দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল। **পঞ্চগড়:** পঞ্চগড় সুগার মিল, বৈদ্যুতিক খুটি প্রস্তুতকারী জেমকন লিমিটেড, জেমজুট কোম্পানী ও তিনটি চা প্রসেসিং ইউনিট। **নীলফামারী:** বাংলাদেশ রেলওয়ে কারখানা, দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস, সৈয়দপুরে ১২টি কারখানাসহ উত্তরা ইপিজেড। **লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে** বড় কোন শিল্প কারখানা গড়েই উঠেনি। এ অঞ্চলের শিল্পের ও কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছে : চাউল কল, ইট ভাটা, বিড়ি ফ্যাক্টরী, কাঠের ফার্নিচার মৃৎশিল্প ও সনাতন শিল্প। তাহলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চাইলে এই অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার এখনই মক্ষম সময়।

রংপুরে শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা বিদ্যমান তার মধ্যে :

কাঠামোগত সমস্যা: প্রাকৃতিক গ্যাসের অভাব এই অঞ্চলে বড় সমস্যা। গ্যাস না থাকায় এই অঞ্চলের শিল্প-কারখানাগুলোতে ফার্নেস অয়েল ব্যবহৃত হয়। ফলে এই অঞ্চলে জ্বালানীর জন্য ঢাকা ও চট্রগ্রামের চেয়ে অনেক বেশী ব্যয় করতে হয়। ফলে রংপুরের পারটেক্স কারখানা,আর কে ফ্যান, পঞ্চগড়ের মার্শাল ডিষ্ট্রিলারিজ, জেমকনসহ শতাধিক কারখানা বন্ধ হওয়ার পথে। ফারনেস অয়েলের অভাবে উত্তর অঞ্চলের একমাত্র সিরামিক কারখানা তাজমা সিরামিক অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

অন্যান্য সমস্যা: বিদ্যুতের স্বল্প সরবরাহ, রাস্তা ও হাইওয়ের স্বল্পতা, সরকারী সহযোগিতার অভাব, দক্ষ উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা ও ভিশনারী উদ্যেক্তার অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, দক্ষ ম্যানেজমেন্টের অভাব, বিদেশ হতে কাঁচামাল আমদানীতে নানান সমস্যা, পণ্য রপ্তানীর জন্য বাংলাবান্ধা, বুড়িমারি, বঙ্গসোনাহাট স্থলবন্দর পুর্ণাঙ্গভাবে ও আধুনিক সুবিধাসহ চালু হয়নি। এখন পর্যন্ত 'রংপুর অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হয়নি' পরিবহন ব্যয় অনেক বেশী, গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এন্ড ডি) খাতে বিনিয়োগ কম, প্রবাসী উদ্যোক্তার অভাব।

রংপুরে শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা : শিল্পায়নে পশ্চাদপদ এলাকা হিসাবে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাগণকে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য সুপারিশমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মূল্য সংযোজন কর যৌক্তিকীকরণ: গ্রামীন ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড ও কৃষি পন্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ইকো প্রডাক্ট এবং ডেইরি শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের সহায়তার জন্য মূল্য সংযোজন কর যৌক্তিকীকরণে সুপারিশমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক (এগ্রো বেজড) শিল্প গড়ে ওঠার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আম (হাড়িভাঙ্গা, সুর্যপুরী) কাঁঠাল, লিচু, আনারস, থেকে জুস, জ্যাম, জেলি, ম্যারম্যালেইড, ফল টিনজাতকরণ, কলা থেকে ড্রায়েট ব্যানানা, ও ব্যানানা চিপস, আলু থেকে পটেটো চিপস, স্ন্যাকস, ফ্রজেন ফ্রেন্স, ফ্রায়েড পটেটোস,পটেটো পাউডার, টমেটো থেকে টমেটো পালপ ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এছাড়াও সবজি জাতীয় কৃষি পণ্যের মধ্যে সীম, লাউ, বেগুন, বাধাকপি, গাজর, ফুলকপি, ঢেড়স, মটরশুটি ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলে উত্তরা ইপিজেড দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের অনেক বেশী সম্ভাবনা রয়েছে। রংপুর হাইটেক পার্ক স্থাপিত হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আইসিটি ও সফ্টওয়্যার শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও টেলিকমিউনিকেশন্স, মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ, ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের সম্ভাবনাও রয়েছে।

রংপুর অঞ্চল শিল্প স্থাপনের জন্য এক উজ্জল সম্ভাবনার স্থান: এখানে রয়েছে দক্ষ-আধাদক্ষ জনশক্তি,সস্তা শ্রম, শিল্পের কাঁচামাল, সড়ক রেল ও বিমান পথের সুবিধা, ইপিজেড এবং শিল্প উপকরণের সহজলভ্যতা। সৈয়দপুর বিমানবন্দর হতে নেপাল ও ভুটানের দুরত্ব খুবই কম। ফলে বিমান বন্দরটিতে আন্তর্জাতিক কার্গো সার্ভিস চালু করে নেপাল ও ভুটানের চাহিদা আছে এমন পন্য তৈরী কারখানা রংপুর অঞ্চলে স্থাপন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কম হবে এবং পন্য রপ্তানিতে সময় কম লাগবে।

রংপুর অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। সৈয়দপুরে উৎপাদিত ট্রাউজার, মোবাইল প্যান্ট, জ্যাকেটসহ অন্যান্য গার্মেন্টস পণ্যের নেপাল ও ভুটানে বেশ চাহিদা রয়েছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উপর ভিত্তি করে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন হওয়ায় এ অঞ্চলে শিল্পের সম্ভাবনা প্রকট হয়েছে। **নিম্নে রংপুর বিভাগের জেলা ভিত্তিক সম্ভাবনাময় খাতের একটি তালিকা প্রকাশ করছি:**

জেলার নাম	সম্ভাবনাময় শিল্পের খাত
কুড়িগ্রাম	পাট ও পাটজাত শিল্প, কাঁঠ শিল্প, বাঁশ শিল্প, দুগ্ধ খামার শিল্প, মৎস্য খামার ইত্যাদি
লালমনিরহাট	সেচযন্ত্রপাতি তৈরী, মধু উৎপাদন, ভুট্টা প্রক্রিয়াজাতকরণ, হ্যাচারি স্থাপন, পাথর সংগ্রহ,পাথর থেকে আরসিসি খুটি তৈরী ইত্যাদি
নীলফামারী	আদা প্রক্রিয়াজাতকরণ, সিরামিক শিল্প, পোশাক শিল্প, পর্যটন শিল্প, গুটি ইউরিয়া তৈরী ও যান্ত্রিক শিল্প
দিনাজপুর	লিচু ও আম প্রক্রিয়াকরণ, সুগন্ধি চাল প্রক্রিয়াকরণ, চালের ব্রান থেকে ভোজ্য তেল তৈরী, অটো রাইসমিল চারকোল তৈরী, জৈবসার ও মিশ্র সার তৈরী, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি
ঠাকুরগাঁও	দুগ্ধ খামার, চামড়াজাত পণ্য, ফল , শাকসবজি ও ফল প্রক্রিয়াকরণ, জৈবসার ও মিশ্র সার তৈরী, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি
পঞ্চগড়	চা প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্ট্রবেরী চাষ,পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, পাথর উত্তোলন, পাথর থেকে বৈদ্যুতিক খুটি ও অবকাঠামোগত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি।

গড়ে উঠছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা, এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। তারই ধারাবাহিকতায় রংপুরের পুত্রবধূ যিনি রংপুরের উন্নয়নের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি তাঁরই হাত ধরে রংপুর বিভাগেও শিল্প ও কর্মসংস্থানের বিপ্লব ঘটবে।

সদস্য সচিব
রংপুর উন্নয়ন ফোরাম

রংপুরের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা

মিজানুর রহমান •

যে কোন সম্ভাবনার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে কতগুলো উপাদান বা শক্তির উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতির উপরে। সে অনুযায়ী রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন করার সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল যদি এর সঠিক পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী সেগুলোর বাস্তবায়ন করানো যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যার ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত রূপ ICT (Information and Communication Technology) একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। ICT বলতে মূলত বোঝায় একটি সমন্বিত ব্যবস্থা যেখানে টেলিকমিউনিকেশনকে ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমে ডাটা বা উপাত্তকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা। জাতিসংঘের International Telecommunication Union সংস্থার জরিপে বর্তমান বিশ্বের সমস্ত উন্নত জাতির মূল চালিকাশক্তি ICT-based উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বাংলাদেশ সরকারও তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহায়ক নীতি হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে করে সরকার তার সমস্ত সেবাকে সহজে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানো, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানো ও কাজে স্বচ্ছতা বাড়াতে আগ্রহী। সাথে সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টিতে সরকারের প্রচেষ্টা আশা জাগানিয়া।

যেমনটি আগেই বলেছি, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে কতগুলো উপাদান বা শক্তির প্রাপ্যতা বা অপ্রাপ্যতার উপর। প্রাপ্যতা যেমন সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে অপ্রাপ্যতা তেমন নতুন কোন উপায় বাতলে দেয়। আমরা যদি গত কয়েক দশকের অর্থনীতির মূল জোগান ব্যবস্থা দেখি তাহলে দেখতে পাই বাংলাদেশের অথনীতিতে মূল জোগান দাতা দুটি সেক্টর: পোশাক শিল্প ও প্রবাসী আয়। এই দুই সেক্টরই মূলত: বাংলাদেশের স্বল্প মজুরীর জনশক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদে অপ্রতুল, বড় বড় শিল্প কারখানায় পশ্চাৎপদ এবং জনবহুল একটি দেশের জন্য এই পরিসংখ্যান খুবই স্বাভাবিক। যেহেতু আমাদের দেশ জনসংখ্যা বহুল, তাই জনগণকে অধিকতর দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে তার সদ্ব্যবহারই আমাদের উন্নতির সবচেয়ে সহজ ও উত্তম পন্থা। এক্ষেত্রে ICT তে দক্ষ জনশক্তি তৈরী ও তাদের ব্যবহার বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

বিশ্ব ব্যাংকের মতে বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ষোল কোটি, যার অর্ধেকরও বেশি মানুষের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছর। একটি দেশের ডেমোগ্রাফিতে এটি একটি গূরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যখন গ্রে-সোসাইটি বা বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে ; তখন বাংলাদেশে তুলনামূলক তরুণ জনশক্তি সম্পন্ন দেশ। তাই সঠিক পরিকল্পনা মাফিক আমাদের এই তরুণ জনশক্তিকে যদি ICT-based শিক্ষার মাধ্যমে অধিকতর দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়। তাদের যদি সঠিক কর্ম পরিবেশ দেয়া যায় তবে ICT বাংলাদেশের জন্য পরবর্তী অর্থনৈতিক সেক্টর হিসাবে অবতীর্ণ করানো সম্ভব।

আমরা জানি, বর্তমানে সরকারের ভিশন ২০২১ এর আওতায় ২০ লক্ষ তরুণকে ICT তে প্রশিক্ষিত করানোর একটি প্রজেক্ট চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে রংপুর অঞ্চলের দিক সরকারের বিশেষ দৃষ্টি ICT-based উন্নয়নকে ত্বরানিত করতে পারে। যেহেতু রংপুর এর অবস্থান ঢাকা হতে তুলনামূলক দূরে এবং অন্যান্য শিল্পেরমত কাঁচামাল যেমন গ্যাসের

অপ্রতুলতা কিংবা বন্দর সংযোগ না থাকা ইত্যাদির কারণে রংপুরে শিল্পায়ন খুব সহজ নয়। সেহেতু ICT-based শিল্পায়নই এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে সহজ উপায়। ICT-based শিল্পের মূল কাচামাল হিসেবে বলা যেতে পারে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি, যা বর্তমানে অনেকটাই প্রতুল। অপরপক্ষে রংপুর বিভাগের আটটি জেলার জনসংখ্যার পরিমাণও অনেক। এমতাবস্থায় রংপুর অঞ্চলকে অনেকটা ভারতের চেন্নাই বা ব্যাঙ্গালোর এর মত অবস্থায় চিন্তা করে এ অঞ্চলে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রংপুরে ICT-based শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি Total-Eco system দাঁড় করাতে হবে। যাতে থাকবে মূলত দুটি বিষয় (০১) শিক্ষা (২) শিক্ষিত জনগোষ্ঠিকে ICT সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিতকরণ।

যদিও রংপুর অঞ্চলে দুইটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কিছু অনার্স কলেজ ও টেকনিক্যাল কলেজ রয়েছে, তথাপি যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ICT-based শিক্ষা নয়। সেক্ষেত্রে সরকারের পাবলিক ও প্রাইভেট দুই ক্ষেত্রে ICT শিক্ষাকে লক্ষ করে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ করে দিতে হবে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হবে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া যাতে শিক্ষার্থীরা তার প্রয়োগ ঘটাতে পারে। এই হাতে কলমে শিক্ষাটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে বিশেষ পরিদর্শনের মাধ্যমে। সাথে সাথে ICT-based শিক্ষা যেহেতু খুবই পরিবর্তনশীল শিক্ষা, তাই এর কারিকুলামকেও আপডেট করতে হবে প্রতিনিয়তই। এক্ষেত্রে সরকার শুধুমাত্র উত্তরাঞ্চলকে কেন্দ্র করেই একটি ICT শিক্ষা কমিশন করতে পারে যেটি এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে পারবে।

অপরপক্ষে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষিত হয়ে সেই সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত হতে পারে সেজন্য এ অঞ্চলে ICT ইনকিউবেটর এর ব্যবস্থা করতে হবে। এই ইনকিউবেটর এর কাজ হবে নতুন কর্মব্যবস্থা তৈরীকরণ। সরকার যদিও ইতোমধ্যে বেশ কিছু এরকম ইনকিউবেটরের ব্যবস্থা করেছে তথাপি তা থেকে ভাল ফলাফল পেতে সরকারকে তার নিজস্ব ICT কাজগুলো দেশের বাইরে ফার্মগুলোকে না দিয়ে ইনকিউবেটরে গড়ে ওঠা ফার্ম দ্বারা করাতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষ কোটা বরাদ্দ করতে হবে। অন্যপক্ষে ইনকিউবেটরে গড়ে উঠা ফার্মগুলো স্বাবলম্বী হলে তারা দেশের বাইরের ICT খাতের কাজ করতে পারবে। মনে রাখতে হবে সব দেশেই লোকাল সাপোর্টেই শিল্পায়ন হয়। সরাসরি বিদেশী কাজের উপর নির্ভর করে কম শিল্পই গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে সরকার উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলো থেকে নূন্যতম ২৫ ভাগ ICT প্রোডাক্ট গ্রহণ করবে তার নিজস্ব কাজে। এটা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই রংপুর অঞ্চলে ICT শিল্প গড়ে উঠবে।

ICT একটি বিরাট সম্ভাবনা আমাদের জন্য। সরকারের ভিশন ২০২১ মতেও এটি প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের মার্কেট। অদ্যাবধি রংপুরে যেহেতু অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠেনি, সেহেতু ICT শিল্পই সবচেয়ে উপযুক্ত নির্বাচন। সরকার ও জনসাধারণের অংশগ্রহণে এটি বাস্তবায়িত হতে পারে।

সহযোগী অধ্যাপক
কম্পিউটার সাইন্স বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (কোতয়ালী থানা)

জাল টাকা তৈরীর সরঞ্জামসহ জাল টাকা উদ্ধার

মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতারসহ ফেন্সিডিল উদ্ধার

চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধারসহ চোর গ্রেফতার

বিপুল পরিমাণ বিদেশী মদ উদ্ধার

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (তাজহাট থানা)

অপহৃত শিশু উদ্ধার ও অপহরণকারী আটক

আন্তঃজেলা চোর চক্রের সদস্য গ্রেফতারসহ চোরাইকৃত ব্যাটারী উদ্ধার

আসামী গ্রেফতারসহ গাঁজা উদ্ধার

ছিনতাইকৃত অটো উদ্ধারসহ মহিলা ছিনতাইকারী আটক

শিশুকে খাওয়ানোর সমস্যা

ডাঃ মোঃ গোলাম আজম •

আমি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ, রংপুর মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত হয়েছি। ১৯৯০ সন থেকে আমি শিশু স্বাস্থ্য ও শিশু রোগের বিষয়ে জড়িত, অর্থাৎ, এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছি এবং পাশাপাশি এ বিষয়ে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি। সাধারণত মায়েরাই তাদের শিশুকে চিকিৎসকের কাছে অথবা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আমরা মায়েদের নিকট থেকে শিশুদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা শুনে থাকি এবং শিশুদের শারীরিক পরীক্ষা করে, প্রয়োজনবোধে কিছু টেস্ট (রক্ত, মূত্র, এক্স-রে ইত্যাদি) করে রোগ সনাক্ত করি। তারপর ব্যবস্থাপত্র ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকি। মায়েরা তাদের শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা আমাদের কাছে তুলে ধরেন। তার মধ্যে একটি সমস্যা কমবেশি সব মায়ের মুখ থেকে শোনা যায়। সেটি হচ্ছে তার শিশুকে খাওয়ানোর সমস্যা, এই সমস্যাটির বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা ও কিছু পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে আমার এই লেখা।

শিশুদের খাওয়ানোর বিষয়ে যেসব সমস্যার কথা মায়েরা উল্লেখ করেন, সেগুলো নিম্নরূপঃ

১। বুকের দুধ কম।
২। খেতে চায় না বা কম খায়।
৩। বাড়ীর খাবার খেতে চায় না।
৪। শাক-সবজি খেতে চায় না।
৫। নিজ হাতে খেতে চায় না।
৬। বেশি খায়।

আমরা (শিশু বিশেষজ্ঞরা) এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব পরামর্শ দিয়ে থাকি, সেগুলো শিশুরোগ বিষয়ক বই (Pediatrics) থেকে প্রাপ্ত। বাংলাদেশের চিকিৎসকরা যেসব বই পড়ে বা অনুসরণ করে সেগুলোর বেশী ভাগেই ব্রিটেন, আমেরিকা, ভারত ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, এসব বইয়ের কোনটিই উপরোক্ত সমস্যাগুলোর পরিপূর্ণ বা সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারেনি।

বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টি দূর করার লক্ষ্যে WHO, UNICEF সহ বেশ কিছু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাজের মাধ্যমে মারাত্মক অপুষ্টি (Severe Malnutrition) এর সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও মায়েদের মুখ থেকে উচ্চারিত সমস্যাগুলোর হার কমেছে বলে মনে হয় না। শিশুদের পুষ্টির বিষয়ে কাজ করে এবং গবেষণা করে এমন কিছু বিশেষজ্ঞের (দেশী এবং বিদেশী) কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, শিশুদের খাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি বা কৌশল (Appropriate Feeding practice) কি হওয়া উচিত, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। কেউ কেউ বলেছেন যে, এ বিষয়ে তারা গবেষণা করে যাচ্ছেন, তবে এটা নির্ণয় করতে আরো অনেক সময় লাগবে। এমনকি সময়টা ৫০ থেকে ১০০ বছরও হতে পারে। তাই বর্তমানে মায়েদের কিভাবে সহায়তা করা যায় এ ব্যপারে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি। পরিশেষে দেশী-বিদেশী বইপত্র থেকে যেসব তথ্য পেয়েছি তার সঙ্গে নিজের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মিশিয়ে একটি পদ্ধতি বা কৌশল নির্ধারণ করেছি। আমার কাছে যেসব মায়েরা উক্ত সমস্যাগুলো নিয়ে আসেন, তাদের সবাইকে আমি এই পদ্ধতি অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়ে থাকি।

পদ্ধতিটি নিম্নরূপ ঃ

১। শিশুর জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ পান করানো শুরু করুন। প্রথম ৩-৪ দিন স্তনে খুব বেশি দুধ থাকে না। সামান্য পরিমান শাল দুধ (Colostrum) থাকে। তবে ১ ফোটা শালদুধে পরবর্তীকালের ১০০ ফোটা দুধের চেয়েও বেশি পুষ্টি থাকে। এ সময়ে যদি স্তনে বেশি দুধ থাকত তাহলে শিশুর বেশ কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা হতো।

২। সঠিক পদ্ধতিতে বুকের দুধ খাওয়ালে ২৪ ঘন্টায় ৬-৮ বারের বেশী দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয় না।

৩। শিশু কান্নাকাটি করে কারণ- শিশুকে সঠিক পদ্ধতিতে কোলে নেওয়া হয় না। সঠিক পদ্ধতিতে দুধ খাওয়ানো হয় না এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কাপড় পরানোর কারণে গরমে অস্বস্তি বোধ করে।

৪। কোলে নেওয়ার সঠিক পদ্ধতি- জন্মের পর প্রথম ৩ মাস শিশুকে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে কোলে নিন, যাতে শিশুর দুই হাত ও মাথা মায়ের পিঠের দিকে ঝুলে থাকে। তারপর শিশুর পিঠে মাঝারি মানের থাপ্পড় দিতে থাকুন। আশাকরি শিশুর কান্না বন্ধ হবে এবং কিছু ক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। তখন বিছানায় শুয়ে দিন।

৫। বুকের দুধ খাওয়ানের সঠিক পদ্ধতিঃ

বিছানায় শায়িত অবস্থায় শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন না। এ ভাবে কোন স্তন্যপায়ী প্রানী বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় না। এটি শিশুর জন্য বেশকিছু স্বাস্থ্য ঝুকির সৃষ্টি করে এবং বুকের দুধ কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে। সটান হয়ে চেয়ারে আরাম করে বসে দুধ খাওয়াতে হবে। শিশুর শরীরের ওজন দুই হাতে বহন করতে হবে। শিশুর মাথা ও ধড় একই লাইনে এবং ভূমির সাথে সমান্তরালভাবে থাকবে। শিশুর পেট মায়ের পেটের সঙ্গে লাগবে। শিশু মুখ হা করলে সম্পূর্ণ স্তনবোটা, বোটার নীচের কালো অংশের কিছুটাসহ মুখের ভিতরে দিতে হবে। এতে শিশুর নাক মায়ের স্তনে লেগে যাবে। তাতে ভয়ের কোন কারণ নেই। দুধ চোষার সময় শিশু শ্বাস নেয় না এবং স্তনের গঠন এমন যে এতে নাকের ধাক্কা লাগলে নাক বসে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, বরং উচু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শিশুকে কখনো স্তনের বোটা চুষতে দেবেন না। বোটা চুষলে শিশু পুষ্টি মিশ্রিত দুধের পরিবর্তে পানি মিশ্রিত দুধ ও বাতাস খেয়ে থাকে। তাই তার বারবার ক্ষিধে লাগে এবং তার পেটে ব্যাথা হতে পারে। এছাড়া এতে বোটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং স্তনে দুধের উৎপাদন কমে যেতে পারে। অনেক মা দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুকে ঝাঁকি দেয়, আবার কেউ জোরে জোরে কথা বলে বা হাসাহাসি করে দুধ খাওয়ায়। এতে শিশুর শরীরের অবস্থান ও ঠোটের অবস্থান পরিবর্তন হয়ে যায় এবং শিশু তৃপ্তিমত খেতে পারেনা। তাই এসব থেকে বিরত থাকা উচিত। শিশু কিছুক্ষণ খাওয়ার পর শ্বাস নেওয়ার জন্য বোটা ছেড়ে দেয়। কিছুক্ষণ শ্বাস নেওয়ার পর যদি তার ক্ষুধা থাকে তাহলে আবার হা করে। তখন পূর্বের মত করে খাওয়াতে থাকুন। এভাবে কয়েকবার খাওয়ার পর তার পেট ভরে গেলে সে আর হা করবে না। এভাবে একবার খাওয়ালে শিশু ২-৪ ঘন্টা আর খেতে চাইবে না। এসময় যদি কান্নাকাটি করে তাহলে বুঝতে হবে অন্য কোন কারণে কাঁদছে, যেমন সঠিক পদ্ধতিতে কোলে চড়ার ইচ্ছা, গরম কাপড়, মল-মুত্র ত্যাগ করার ইচ্ছা ইত্যাদি।

৬। সঠিক পদ্ধতিতে বুকের দুধ খাওয়ালে শিশুর বয়স যখন ২-৩ মাস হয়, তখন শিশু খাওয়ার সংখ্যা নিজেই কমিয়ে দেয়। ২৪ ঘন্টায় ৪-৬ বার খাওয়ালেই সে শান্ত থাকে। এভাবে খাওয়ালে শিশু ২ বছর থেকে ২.৫ বছরের মধ্যে নিজ থেকেই মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়।

শিশুর বাড়তি খাবার (সম্পুরক খাদ্য)

৬ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধই শিশুর একমাত্র খাদ্য। এ সময় পানিও দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ৬ মাস বয়সের পর শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য দিতে বলা হয়। এ ব্যাপারে শিশু বিশেষজ্ঞগণ ও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বইপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী মায়েদের যেসব পরামর্শ দিয়ে থাকেন তা অনুসরণ করতে গিয়ে মা ও শিশু উভয়েই বিড়ম্বনায় পতিত হয়। সাধারণত যেসব খাদ্য এবং যে পরিমাণ খাদ্য শিশুকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, বেশির ভাগ শিশু সেই খাদ্য বা সেই পরিমাণে খাদ্য খেতে চায় না। মায়েরা জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন অথবা বিভিন্ন

কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে অল্প কিছু দিনের মধ্যে শিশু খাদ্য গ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এমনকি অনেক শিশু মায়ের দুধ খাওয়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেলে।

এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ নিম্নরূপ ঃ

৬ মাস বয়সের পর শিশুকে বাড়তি খাবার খাওয়াতে হবে না। পারিবারিক খাদ্য খাওয়া শেখাতে হবে। শিশুকে খাওয়া শেখানোটা অনেকটা লেখাপড়া শেখানোর মত। Play group বলে স্কুলে একটা Class আছে, এক বছরের কোর্স। এখানে খেলার ছলে শিশুকে কিছুটা লেখা-পড়া শেখানো হয়। শিশুকে খাইয়ে না দিয়ে যদি ৬ মাস বয়স থেকে খাওয়া শেখানো হয় তাহলে ১৩-১৫ মাস বয়সের মধ্যে তিন বেলা নিজ হাতে পারিবারিক খাদ্য খাবে। এজন্য যা করতে হবে তাহলো এরকম-

৬ মাস ১দিন বয়স থেকে খিচুড়ি জাতীয় খাদ্য (চাল-ডাল-শাক সবজি, ডিমের কুসুম দিয়ে তৈরি) আঠালো তরলের মতে করে শিশুর আঙ্গুলে লাগিয়ে শিশুকে চুষে খেতে দিন। শিশুরা ৫-৬ মাস বয়স থেকে নিজের হাতের আঙ্গুল চুষতে থাকে এর অর্থ হলো আমার আঙুলে খাবার লাগিয়ে দিলে আমি চুষে খেতে পারব। প্রথম দিকে দিনে ২বার, পরে দিনে ৩-৪ বার দেওয়া যেতে পারে (শিশুর আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী) প্রথম কয়েক মাস মিষ্টি জাতীয় খাবার, ফল এমনকি মাছ-মাংস দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। এতে শিশুর শাক-সবজী খাওয়ার অভ্যাস তৈরি হবে। ৮-৯ মাস বয়স থেকে খাবারটা কিছুটা শক্ত করে তৈরি করতে হবে। এমনকি বড়রা যে ভাত বা খিচুড়ি খায়, তাও দিয়ে দেখতে হবে। দেখা যাবে শিশু ১-২টি করে খাদ্য দানা মুখে তুলে দিচ্ছে এবং খাওয়ার চেষ্টা করছে এবং দিন দিন খাওয়ার পরিমান বাড়ছে। ০৯-১০ মাসের মধ্যে শিশু যখন তিন বেলা নিজ হাতে সবজি-খিচুড়ি খেকে অভ্যস্ত হবে তখন একটু একটু করে মাছ-মাংস, ডিমের সাদা অংশ দিতে থাকুন।

কোন কেনা শিশুখাদ্য, দুধ বা দুধের তৈরি কোন খাদ্য দিবেন না। এমনকি চকলেট, বিস্কুট নডুলসও নয়। তাহলে আশা করা যায় ১৫-১৮ মাসের মধ্যে শিশু নিজের হাতে তিন বেলা পারিবারিক খাদ্য নিজে খাবে এবং মাকে খাইয়ে দিবে। তখন ফলমুল দিতে থাকুন, তাহলে ২৪-৩০ মাসের মধ্যে বুকের দুধ খাওয়া ছেড়ে দিবে। প্রথম দিকে শিশু আঙ্গুলের খাবার গায়ে, মাথায় বা কাপড়ে লাগাবে- এতে হতাশ হওয়া চলবে না বা একে নোংরামী ভাবাও চলবে না।

আমার কাছে আগত সকল মাকেই আমি উপরে উল্লিখিত পরামর্শসমূহ প্রদান করে থাকি, কেউ অনুসরণ করে, আবার হয়ত কেউ করে না। বিষয়টি প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় ও বিজ্ঞাপণে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। তবে যেসব মায়েরা অনুসরণ করেছেন তাদের একজনও আমাকে বলেননি যে - তিনি সুফল পাননি। তাই সকল মা এবং সকল শিশু বিশেষজ্ঞগণের প্রতি আমার আহবান এই যে - পদ্ধতিটি কার্যকরী কি না? তা নিজেই যাচাই করে দেখুন।

প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক
শিশু বিভাগ
রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর

অজ্ঞাতনামা চুরি মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটনে একজন পুলিশ অফিসারের সফল প্রচেষ্টা

মোঃ শহিদুল্লাহ কাওছার পিপিএম-সেবা ●

অপরাধ বিভাগ নবগঠিত মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এবং ০৬ টি থানার সমন্বয়ে গঠিত হয়। এ বিভাগটি আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর প্রথম দিন থেকেই মহানগরী এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদসহ সকল প্রকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের মাঝে দ্রুত পুলিশী সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ও Clueless হত্যা মামলার আসামী সনাক্তকরণ, দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার এবং মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মাঝে আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সাধারণত আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরণের চুরি ও ডাকাতির মত অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। এ ধরণের অপরাধ জনমনে ভীতির সঞ্চার ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ও গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ সমূহ অত্যন্ত দক্ষতা, নিষ্ঠা, পেশাদারিত্বের সাথে তদন্ত করতে হয়। অনেক সময় এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের সময় প্রত্যক্ষ সাক্ষী থাকে না এবং অপরাধীরা অজ্ঞাত থাকে। তখন ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা অনেক বেশি কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে।

গত ১৭ অক্টোবর ২০১৮ সালে আমি রাত্রীকালীন টহল ডিউটি তদারকী করে রাত অনুমান ০৩.০০ টার দিকে বাসায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ ভোর ০৬.০০ দিকে মোবাইল ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ফোন ধরার আগে ভাবলাম কোন সমস্যা হয়েছে নিশ্চই। এসময় তাজহাট থানার সামনে মর্ডাণ মোড়ের কাছে ভোরের দিকে দুটি দোকানে দূর্ধর্ষ চুরির সংবাদ জানতে পারি। অজ্ঞাতনামা সংঘবদ্ধ চোরের সদস্যগণ ০২ টি দোকানে প্রবেশ করে সেখান থেকে অনেকগুলো অটো চার্জারের ব্যাটারী ও অন্যান্য মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়। নবগঠিত মেট্রোপলিটন এলাকার তাজহাট থানার সন্নিকটে বড় ধরনের চুরির বিষয়টি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

চুরির সংবাদ জানার পর আর ঘুমানোর সুযোগ হলো না। ফ্রেশ হয়ে দ্রুত সকালের নাস্তা সেরে চুরির বিষয়ে তদন্তের জন্য ঘটনাস্থল তাজহাট থানার মর্ডাণ মোড়ে উপস্থিত হলাম। এ সময় তাজহাট থানার ওসি, রাত্রীকালীন ডিউটি পার্টির সদস্য, দোকানের মালিকদ্বয় এবং স্থানীয় লোকদের ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম যে, অজ্ঞাতনামা সংঘবদ্ধ চোরের সদস্যগণ ভোর অনুমান ০৪:০০ থেকে ০৪:৩০ টার দিকে জনাব শাহীন এবং জনাব মনিরুল মিঠুর দোকান হতে মোট ৩২ সেট অটো চার্জারের ব্যাটারী (আনুমানিক মূল্যঃ ৫,৯৭৫০০/= টাকা) ও অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় । কিন্তু চুরির সাথে জড়িত আসামীদের বিষয়ে কেউ কোন তথ্য দিতে পারল না। এরপর সারাদিন স্থানীয় লোকজনদের ডেকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। সেই সময় একজন ব্যক্তি জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানান, তিনি একজন অটো চালক। ভোর অনুমান ০৪.১৫ টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে মর্ডাণ মোড়ে আসার সময় তিনি শাহীন ট্রেডার্স নামক দোকানের সামনে উপস্থিত হলে সেখানে ৭/৮ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি উক্ত দোকানঘর থেকে ব্যাটারী চুরি করে ট্রাকে উঠাচ্ছিল। তিনি আরো কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলে তারা অস্ত্র ও ধারালো ছোড়া দিয়ে ভয় দেখালে তিনি প্রানের ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান। সংঘবদ্ধ চোরের সদস্যগণ দোকানের মালামাল চুরি করে ট্রাকে করে সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। চুরির সাথে জড়িত আসামীদের কাউকে তিনি চিনতে পারেন নাই তবে চোরাই কাজে ব্যবহৃত ট্রাকের রেজিঃ নাম্বারঃ-ঢাকা-মেট্রো-ট-১১-৩৬৯৯ ছিল বলে তিনি আমাকে জানান।

চুরির ঘটনায় তাজহাট থানায় সূত্রোক্ত মামলাটি রুজু হলে ট্রাকের রেজিঃ নাম্বার এবং মোবাইল প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে নিরবচ্ছিন্নভাবে তদন্ত শুরু করি। প্রথমে বিআরটিএ, রংপুর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবহৃত ট্রাকের রেজিঃ নাম্বারের মালিকের বিষয়ে তথ্য জানার চেষ্টা করি। তাদের দেয়া মালিকের নাম-ঠিকানা, এনআইডি নাম্বার, মোবাইল নাম্বার ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করি কিন্তু সরবরাহকৃত তথ্য সঠিক না হওয়ায় কিছুটা হতাশ হলাম। পুনরায় বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবহৃত ট্রাকটির Histry Sheet সংগ্রহ করি। Histry Sheet পর্যালোচনায় জানতে পারি উক্ত ট্রাকটি ইং ২০১১ সালে ঢাকার একটি লিজিং কোম্পানীর কাছ থেকে আর্থিক লোনে ক্রয় করা হয়েছিল।তবে তাদের কাছে এই তথ্য ছাড়া আর অন্য কোন তথ্যই সংরক্ষিত ছিল না।পরবর্তীতে ট্রাকটির মালিকানা বিভিন্ন নামে পরিবর্তিত হয় বলে জানতে পারি। এরপর পুনরায় ট্রাকটির সর্বশেষ Route Permit বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পারি ট্রাকটি গত ২৫-০৫-২০১৭ সালে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিআরটিএ থেকে নতুন করে Route Permit Issue করা হয়েছিল। এই বিষয়ে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগযোগ করি কিন্তু তারা ট্রাকটির মালিকের বিষয়ে কোন তথ্যই দিতে পারেন নাই। এরপর ব্যক্তিগতভাবে Route Permit এর আবেদনকারীর নাম-ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করি। তার সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম তিনি চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিআরটিএর একজন ব্রোকার। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে অনেক পরিচিত-অপরিচিত লোকদের বাস, ট্রাক ও যানবাহনের Registration, Re-registration,Route Permit and Renew এর কাজে তাদের সহায়তা করে থাকেন। তার নিকট ব্যবহৃত ট্রাকের রেজিঃ নাম্বারঃ- ঢাকা-মেট্রো-ট-১১-৩৬৯৯ এর প্রকৃত মালিকের নাম জানতে চাইলাম। একথা বলার পর তিনি কিছুটা সময় নিয়ে বললেন ট্রাকটির মালিক সম্ভবত খলিলুর রহমান এবং এর চেয়ে বেশী কিছু তার সম্পর্কে জানেন না। তবে কয়েক বছর আগে সে বেশ কয়েকবার তাকে ফোন করেছিলো। সেই সময় তার একটি ট্রাকের কি যেন সমস্যা হয়েছিল ? এ মুহূর্তে তার সে বিষয়টি মনে পড়ছে না তবে সেই সময় ঢাকা থেকে তার নিকট একজন লোক পাঠিয়েছিল। পরে বিআরটিএর সাথে যোগাযোগ করে তার কাজটি করে দিয়েছিলেন। বর্তমানে তার নিকট সেই ট্রাক মালিকের মোবাইল নাম্বার আছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম এবং যদি থাকে তাহলে সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম। তিনি কিছুক্ষণ পরে মালিকের সেই সময়ের ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার দিয়ে আমাকে সহায়তা করেন। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, স্যার আমি যদি মালিক সম্পর্কে আরো তথ্য পাই তাহলে আপনাকে অবশ্যই জানাবো। এরপর প্রযুক্তিগত সহায়তায় ট্রাকটির প্রকৃত মালিকের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করি। এভাবে গত ১৭-১১-২০১৮ থেকে ১৯-১১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তদন্ত করে দ্রুত সময়ের মধ্যে গত ইং ১৭-১১-২০১৮ তারিখে তাজহাট থানায় সংঘটিত অজ্ঞাতনামা চুরির ঘটনায় ব্যবহৃত ট্রাক সনাক্তকরণ, চুরির সাথে জড়িত ট্রাকের চালক, হেলপার, সংঘবদ্ধ ডাকাত ও চোর সদস্যদের সনাক্ত করতে সক্ষম হই। তদন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সম্মানিত পুলিশ কমিশনার, আরপিএমপি, রংপুর মহোদয়কে অবহিত করি। সম্মানিত পুলিশ কমিশনার, আরপিএমপি, রংপুর মহোদয়ের নির্দেশে আমার নেতৃত্বে তদন্তকারী অফিসার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) মোঃ তাজমিলুর রহমানসহ অন্যান্য অফিসার এবং পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে অপারেশন টিম গত ১৯-১১-২০১৮ইং তারিখ হতে ২২-১১-২০১৮ ইং তারিখ পর্যন্ত ঢাকা, খুলনা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করি। অভিযানকালে চোরাই কাজে ব্যবহৃত ট্রাক রেজিঃ নং-ঢাকা মেট্রো-ট-১১-৩৬৯৯ জব্দসহ জড়িত আসামী যথাক্রমে ট্রাকের ড্রাইভার ১। মোঃ আফছার আলী ও হেলফার ২। মোঃ মাসুদ রানাকে ঢাকা শ্যামপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করি। তাদের দেওয়া তথ্য মতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে ঘটনার সাথে জড়িত অপর আসামী ৩। মোঃ জাকির হোসেন ৪। মোঃ মনু মিয়া ও ৫। কাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। জড়িত আসামীদের নিকট হতে চুরি যাওয়া ৩২ সেট ব্যাটারীসহ আরো ৩৩ সেট মোট ৬৫ সেট চোরাইকৃত ব্যাটারী উদ্ধারসহ চোরাই কাজে ব্যবহৃত অপর একটি ট্রাক জব্দ করতে সক্ষম হই। গ্রেফতারকৃত আসামীদের পিসিপিআর এবং সিডিএমএস পর্যালোচনায় বেশ কয়েকটি ডাকাতি এবং চুরির সাথে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। গ্রেফতারকৃত সকল আসামীদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করলেচুরি সাথে সরাসরি জড়িত থাকার বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি দেন। তাদের দেয়া স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি থেকে ঘটনার সাথে জড়িত অন্যান্য আসামীদেরও পরবর্তীতে সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

অভিযানে চোরাই কাজে জড়িত আসামী, চোরাই কাজে ব্যবহৃত দুটি ট্রাক ও ৬০ সেট ব্যাটারী উদ্ধার

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানায় রুজুকৃত দুর্ধর্ষ চুরি মামলাটি নিরবিচ্ছিন্ন তদন্তের মাধ্যমে অপরাধের সাথে জড়িত অজ্ঞাতনামা আসামীদের সনাক্তকরণ ও গ্রেফতার, চোরাইকাজে ব্যবহৃত ট্রাক সনাক্তকরণ, আটক ও জব্দকরণ, গ্রেফতারকৃত আসামীদের হেফাজত হতে চোরাইকৃত মালামাল উদ্ধার এবং সর্বোপরি গ্রেফকারকৃত সকল আসামীগণ বিজ্ঞ আদালতে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি প্রদান করায় মামলার রহস্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়। এর ফলে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ও ভাবমূর্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

পুলিশ বাহিনীর অন্যতম কাজ হলো সুষ্ঠুভাবে মামলা তদন্ত করা। যার মাধ্যমে সংঘটিত সকল ধরণের অপরাধের সত্যতা ও রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়। কিন্ত তদন্তের মাধ্যমে অপরাধের সত্যতা ও রহস্য উদ্ঘাটন করা না গেলে পুলিশের সকল প্রচেষ্টাই অনর্থক। অপরদিকে সংঘটিত Clueless, গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্য ও সত্যতা উদ্ঘাটন করা আরো বেশি জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর পুলিশ অফিসারগণ এই ধরণের মামলা তদন্ত যদি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন তাহলে মামলার রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

সূত্রঃ তাজহাট থানার মামলা নং-০৮, তারিখ-১৭/১১/২০১৮খ্রিঃ , ধারা-৩৮০/৪৬১ পেনাল কোড

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (মাহিগঞ্জ থানা)

অস্ত্রের মুখে অটোরিক্সা ছিনতাইকালে হাতেনাতে আসামী গ্রেফতার ও অটো উদ্ধার

টিসিবির পণ্য কালোবাজারীর মাধ্যমে বিক্রয়কালে আসামী গ্রেফতারসহ পণ্য উদ্ধার

মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার ও মাদক উদ্ধার

খুন মামলার ০২ জন আসামী অস্ত্রসহ গ্রেফতার

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (হারাগাছ থানা)

সিরিয়াল ধর্ষক রাসেল (গোল চিহ্নিত) সহযোগীসহ গ্রেফতার

ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ছিনতাইকৃত অটো উদ্ধার ও ছিনতাইকারী গ্রেফতার

ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

A brief analysis on linking Police Force in the Court's proceeding of civil litigation

Mosahaddeque Minhaz •

The police department's significant role in dispensing justice is indubitable. Herein i have intentionally avoided the all familiar criminal justice system rather to look into its verifiable organizational impact on civil justice system. The classical notion of investigation onto offenses, arrest of accused or witnesses and preemptive actions against provable offenses lets be kept aside to travel around the horizon of civil jurisdiction for a while.

Police department is one of those services in this country which has its organizational set up in the lowest grass root administrative units, even in the Upozilla of the remotest area does have a police station. Therefore, due to its organizational structure & periphery of works it has become the first response team in any area in the country for almost all public causes. It's imminent that there will be no police station which doesn't confront the question of civil disputes in sideline of regular criminal occurrence. Now the natural question is does police department has any mandate to get involved in the civil matter likewise Code of Criminal Procedure and other special laws which enable the police department to exercise legitimate powers for dispensing criminal justice? Generally involvement of police force required in civil court's proceeding or civil justice system after the original suit's fate is finalized-in order to execute the verdict through attachment of property, arresting defaulters of court's order for civil imprisonment etc the interference of police force thus required. In fact there is no single reference made in the Code of Civil Procedure 1908 linking police station or police officer or force. Still every civil court of original jurisdiction sometimes in order to protect public peace and for ends of justice send requisitions for police force including officer after their transport and dearness allowances are privately being paid. Actually the mandate of the civil court emanates from the rule 226 (1) of Civil Rules and Order, Volume-1 which is as follows -

"A decree holder praying for police help in execution shall state in his application the full reason thereof, supported, if required, by an affidavit. The Court may further examine the decree-holder or such persons as it thinks fit touching the necessity of police help. If upon a consideration of all the facts and circumstances, the presiding judge is of the clear opinion that there are reasonable grounds to suppose that execution will not be affected without serious danger to the public peace, he may, after recording his reason for so doing, make a request to the Superintendent of police of the district for such police aid as the latter may be able to give in the execution of the writ, It is to be understood that police help is to be regarded as an extreme step and it should not be recommended unless the court is fully convinced of the existence of a grave emergency."

Police Regulation of Bengal has directing force over police, magistrate and people at large; same is applicable for Civil Rules and Orders. It is equally related to judges, police and people at large. As authorized in the article 107 of the Constitution and section 122 of the

Code of Civil Procedure 'Civil Rules and Orders' was mustered by the Supreme Court which is meant to be guidelines of the practice and procedure of civil matter of subordinate judiciary. Those who still dubious as to the CRO's (Civil Rules and Orders) force must keep in mind the definition of law given in the constitution-

"Law means any act, ordinance, order, rule, regulation, bye law, notification or other legal instrument, and any custom or usage having the force of law in Bangladesh ."Rules/Regulations are the delegated legislation has the same force of law like as act of parliament.

Every civil court of original jurisdiction inherently can exercise the power of a criminal court when it's lawful order such as order of injunction or order in pursue of execution of decree is being violated by those against whom order is inflicted upon . There will be situations when these courts likewise criminal courts will issue writ in relation to attachment of property, conviction warrant or warrant of arrest against the violators. It is reasonably expected that police will stand against those offenders alongside the civil court to upheld justice. Apart from this a judge of family court is the rarest instance who enjoys the civil court's power and at the same time he or she is a magistrate of the 1st class while executing a verdict of a family court. A judge of family court is empowered to inflict conviction upon any judgment debtor and can make the debtor undergo the punishment by arresting him with the aid of police .

Under section 145 of Code of Criminal Procedure, 1898 wherein both civil and criminal jurisdiction cross each other as both executive magistrate and police in order to prevent the breach of peace can look into the possession of a particular property and executive magistrate may decide possession in favor any party for a limited period. But it must be kept in mind that if a suit relating to the same subject matter is pending before the civil court they shall restrain themselves dealing with these. I would like to draw the attention upon a case reference and two consecutive articles of the Constitution of People's Republic of Bangladesh. In the case "Ghulam Habib vs State (WP)-" Magistrate is not justified in taking action under section 145(4) Cr,P,C when the fact of pendency of civil litigation between the parties over the disputed property is brought to his notice and especially when security proceeding over the same are pending in his court."

In absence of specific statutory law the judgment of the highest court take precedence of others for regulating legal question. In this respect I would to like mention two articles of the constitution.

"Article-111: The law declared by the Appellate Division shall be binding on the High Court Division and the law declared by either division of the Supreme Court shall be binding on all courts subordinate to it."

"Article-112: All authorities, executive and judicial, in the Republic shall act in aid of the Supreme Court."

Whatever decisions are made on any matter by the Supreme Court (Either Division) is equally binding upon subordinate judiciary or any organization of this realm.

There are some incidents when some persons can be both civil and criminally liable. Such as prosecution under section 406 and 420 of the Penal Code can't absolve the offender to be skipped away from the civil jurisdiction in the shape of money suit or others. Custody in regard to the unfortunate parentless children can be decided by the judges of family court . There is recent phenomenon deserted children are here and there and willing parents can

be sent to concerned family court by the police to have a custody order.

I told earlier here in any situation police is the organization first to response. It is not necessary that police will be educated as to civil laws same as criminal law, nevertheless having basic knowledge relating to people's rights, properties and civil laws by police will enable them to suggest a justice seeker to take rightful course of action. Most of the civil disputes in this country are upon one or two intricate legal issues which generally are not known by the village elders, members or chairman. Intermeddling by the half educated and wicked persons is leading the parties of disputes to unending sufferings. Even this has to be borne by generation after generation. Outside the court house the corrupt land administration and inside the selfish advocacy has aggravated civil litigant's sufferings as well. Being judges we are in consensus that unresolved civil disputes are resulting in both varieties of civil suits and criminal cases. It is incumbent upon the police station that there are vigilant enough not to receive cases or submit charge-sheets on false and fabricated facts which were just lodged to keep pressure upon the opposite side or to keep him allow to remain in bargaining table. It is the simple truth that unless you feel safe and secured by the state mechanism your enjoyment of civil rights and properties gets deluding away.

---

1 *Commentary on Civil Rules and Order by justice Siddiqur Rahman Miah*

2 *Article 152 of The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (Interpretation)*

3 *Delegated legislation is a legislation enacted by a state organ instead of Parliament after receiving authority from the act of Parliament or articles of the constitution.*

4 *Rule-2 of Order 39, Order 21 of the Code of Civil Procedure, 1908.*

5 *Section 16(3B) of Family Court Ordinance, 1985*

6 *28 DLR (WP)(1976),Page-11.*

7 *Section 406 lays down the definition of criminal breach of trust and section 420 as to punishment for cheating.*

8 *Section 5 of the Family Court Ordinance, 1985.*

Senior Assistant Judge
Bangladesh Judicial Service

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার ও গুজব সন্ত্রাস: মোকাবেলায় সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

তাবিউর রহমান প্রধান •

একবিংশ শতাব্দীতে এসে ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের জীবনকে অনেকভাবেই সহজ করে তুলেছে এটা সত্যি। কিন্তু এর বিপরীত দিকও আছে। এসব মাধ্যমের প্রতি আসক্তি এবং এগুলোর অপব্যবহার এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মানসপটে। ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহারের প্রতি স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। কিছু দিন আগে একটি জাতীয় গণমাধ্যমের আয়োজনেও 'সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি' শীর্ষক এক আলোচনায় এমন মতামতই দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিশেষ করে ফেইসবুকে গুজব ও অপপ্রচার একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য কিছু দেশ ফেইসবুক সেন্সর করেছে, কিছু দেশ ফেইসবুক নিষিদ্ধ করেছে। যদিও সেগুলো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না। তবে ফেইসবুকের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যা ডিজিটাল প্রযুক্তিগতভাবে সমাধান করা যায়, ফিজিক্যালি ধর পাকড় ও গ্রেফতার এ সমস্যার সমাধান নয়। এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার কিংবা গুজব সন্ত্রাস যাই বলি না কেন সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় এগুলো শুধু ব্যক্তি জীবনেই না জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও দিন দিন অনিরাপদ করে তুলছে। এক্ষেত্রে এই সংকট মোকাবেলা করতে গিয়ে রাষ্ট্রকে যেমন সচেতনতার সাথে কঠোর হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে, তেমনি ব্যক্তি থেকে শুরু করে পারিবারিক কিংবা সামাজিকভাবেও প্রতিরোধ গড়ে তুলে ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্রকে নিরাপদ করতে সহযোগিতা করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, 'কোনও ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়া বিভিন্ন ইস্যুতে ফেইসবুকে গুজব ও অপপ্রচার চালানোর ফলে এটি এখন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে'। তাছাড়া যারা গুজব ও মিথ্যাচার করে সামাজিক গণমাধ্যমের অপব্যবহার করে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে শূন্য বা 'জিরো টলারেন্স' নীতি অবলম্বন করার ঘোষণা দিয়েছে, এমনকি অপপ্রচারকারীদের শক্ত হাতে দমন করা হবে বলেও বিভিন্ন সময় জানানো হয় সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু শক্তভাবে দমন করা বলতে যদি শুধু গ্রেফতার, রিমান্ড ইত্যাদি বোঝায়, তাহলে বলতে হয়, এই শক্ত পদ্ধতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষতিকারক মিথ্যাচার বন্ধ করতে পারবে না।

এদিকে শুধু তথ্য ও প্রযুক্তি আইন প্রয়োগ করে ফেইসবুকে গুজব ও মিথ্যা খবর বন্ধ করতে গেলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। ডিজিটাল অপরাধের উৎস সন্ধান করে অপরাধীকে গ্রেফতার করলে প্রকৃত অপরাধীরা শাস্তি পাবে। অন্যথায় শুধুমাত্র প্রচারকারীদের আইনের আওতায় আনলে অনেক সময় নির্দোষ মানুষ সাজা পায়। কারণ ভুয়া খবর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুয়া আইডির মাধ্যমে ছড়ানো হয়। এই গুজবগুলো অনেক ক্ষেত্রে দেশের বাইরে থেকেও ছড়ানো হয়, যার জন্য প্রকৃত অপরাধীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে।

জার্মানীর নতুন আইনে ফেইসবুক ও অন্যান্য ডিজিটাল মিডিয়ার বিষয়বস্তু সেন্সর করার আইন করা হয়েছে। ফেইসবুকে ঘৃণা, বিদ্বেষমূলক ও ক্ষতিকারক খবর প্রকাশ হলে তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে, অন্যথায় ৫০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করা হবে। জানা গেছে ফেইসবুককে ইতিমধ্যে একাধিক বার জরিমানা করা হয়েছে। মুক্ত গণতন্ত্রের দেশ যুক্তরাজ্যেও ফেইসবুকসহ সামাজিক মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করার আইন আগের চেয়ে কঠোর করা হয়েছে।

ডিজিটাল মিডিয়াগুলোকে সন্ত্রাসী ও জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী খবর ফিল্টার করতে বলা হয়েছে। শাস্তি সব দেশেই কঠোর করা হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে তথ্য ও প্রযুক্তি আইনগুলো প্রয়োগ করা হয় সাইবার অপরাধ ঠেকানোর জন্য। সাইবার অপরাধ বলতে প্রযুক্তিগত বিষয় যেমন হ্যাকিং, স্পামিং, আইডেন্টিটি চুরি করা- এইসব বোঝায়। এদিকে কিছু কিছু গুজব দেশদ্রোহী কাজের মধ্যে পরে, কিছু গুজব যেগুলো দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয় যেগুলো সন্ত্রাসী কাজের মধ্যে করে। ধর্মকে অবমাননার জন্য অনেক সময় ফেসবুককে একটা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ফেসবুকের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে এখান থেকে ছড়ানো হচ্ছে ধর্মীয় বিদ্বেষ আর বিভিন্ন গুজব। সাম্প্রতিক সময়ে এখন পর্যন্ত দেশে ধর্মকে কেন্দ্র করে যতগুলো সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে সবই ফেসবুক থেকে। ২০১৭ সালের নভেম্বরে ফেসবুকের গুজবের সূত্র ধরে রংপুরের গঙ্গাচড়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে একটি ফেইসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে। এর আগে ২০১২ সালের শেষ দিকে সামাজিক যোগাযোগ সাইট ফেসবুকে পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননা করে ছবি সংযুক্ত করার অভিযোগে রামু উপজেলার বৌদ্ধ বসতি এলাকায় চালানো হয় তাণ্ডব। এ সময় ১২টি বৌদ্ধমন্দির এবং বৌদ্ধদের ৩০টি বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছিল। শতাধিক ঘরবাড়ি এবং দোকানপাটে হামলা ও লুটপাট চালায় সুযোগ সন্ধানীরা। এছাড়াও কুমিল্লার হোমনা, পাবনার সাঁথিয়া, সাতক্ষীরার ফতেহপুরে এমন গুজব থেকেই ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। গুজবের কারণে সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলোর অন্যতম হলো, কিছু দিন আগে নিরাপদ সড়কের দাবিতে টানা সাত দিন সড়কে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মধ্যে আন্দোলনকে ঘিরে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়া। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া বিভিন্ন পোস্টে গুজব ছড়ানো হয়, শিক্ষার্থীর মৃত্যু ও ছাত্রী ধর্ষণের। পরে পুলিশ অভিযুক্ত বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করে আইনের আওতার আনে। এসব ক্ষেত্রে উদ্বেগের বিষয় হলো- সমাজের অনেক শিক্ষিত মানুষ এসব গুজবে গা ভাসিয়ে সহিংসতা কিংবা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন।

এদিকে পদ্মা সেতুতে মানুষের মাথা ও রক্ত লাগবে বলে এই গুজবকে কেন্দ্র করে সারাদেশে ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে বেশ কয়েক জনকে হত্যা করার ঘটনা ঘটেছে। মূলতঃ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে সারাদেশে এই মিথ্যা গুজব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জনসাধারণ ফেসবুকে প্রচারিত এই মিথ্যা গুজবে কান দিয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সারাদেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এই গুজবের ফলে। কিছু গুজবপ্রিয় ও অতি উৎসাহী লোক ছেলে ধরা সন্দেহে নিরপরাধ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এসব কারণে কখনো নির্দোষ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছে আবার কখনো ধ্বংস হয়েছে গোটা পরিবার। সম্প্রতি রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় ছেলে ধরা সন্দেহে তাসলিমা বেগম রেনু নামের একজনকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় ওই নারীর জীবন প্রদীপই শুধু নিভে যায়নি, অনিশ্চয়তায় পড়েছে তাঁর শিশু সন্তানের জীবন। উক্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা দেশের সকল মানুষের মনস্পটে দাগ কেটেছে। অথচ এমন জঘন্য ঘটনার একমাত্র কারন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সৃষ্ঠ গুজব যাকে আমরা 'গুজব সন্ত্রাস' বলে অভিহিত করছি। ফেইসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যমগুলোর মিথ্যা খবর ও গুজব ছড়ানোয় অনেক সময় দেশের চরম ক্ষতি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি শ্রীলংকায় ফেসবুকে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ছড়ানোর কারণে সে দেশের সরকারকে ৭ দিনের জন্য ফেসবুক বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো ফেসবুকের গুজব ও মিথ্যা খবর ধর-পাকড়ের মাধ্যমে প্রতিকার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যেই ফেইসবুক এর মাধ্যমে এই ক্ষতিকর, জনস্বার্থ বিরোধী কাজগুলো হচ্ছে, সেই ফেইসবুকের শাস্তি হচ্ছে না। ফেইসবুক একটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। যেকোনো যোগাযোগ মাধ্যমেই বিদ্বেষমূলক, সন্ত্রাসী ও দেশদ্রোহী খবর ছড়ালে তার দায়িত্ব তাদের আছে। ফেইসবুকের এইসব ক্ষতিকারক খবর ছড়ালে, তার প্রতিকার করার দায়িত্ব তাদেরই। এ দায়িত্ব শুধু বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা পুলিশের নয়। যেকোনো অপপ্রচারের অভিযোগ সব সময় ফেসবুকের উপর আসে। প্রকৃতপক্ষে ফেসবুকের চেয়ে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং যেমন হোয়াটস আপ, ভাইবার ইত্যাদি প্লাটফর্মে মিথ্যা খবর বহু গুণিতক আকারে প্রচার হয়। ফেইসবুকের খবরের উৎস হয়তো বের করা যায়। কিন্তু এইসব ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং এর উৎস বের করা খুবই কঠিন। আরেকটি কঠিন সত্য- মানুষ আসল খবরের চেয়ে 'মিথ্যা কিংবা চটকদার' খবরের প্রতি আকর্ষিত হয় বেশি। সাধারণ ও নিরপেক্ষ জনগণও

গুজবগুলো না বুঝেই ছড়িয়ে দেয়। তাদের বন্ধুরাও আবার সেগুলো শেয়ার করে। এইভাবে গুজব জোরালোভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পরে। গুজব ও অপপ্রচার বন্ধের জন্য ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগের মতো কৌশল অবলম্বন করলে তা কিছুটা ফলপ্রসূ হতে পারে। দেশে সাড়ে তিন কোটির বেশি ফেসবুক ব্যবহারকারী আছে। তাছাড়া প্রবাসেও প্রচুর ব্যবহারকারী আছেন। সুতরাং ফেইসবুক কখনোই এতো ব্যবহারকারী হারাতে চাইবে না, বাংলাদেশ সরকার এমন দাবি তুললে তারা তা মানবে। সরকারের উচিৎ হবে জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের মতো কঠোর অবস্থানে দাঁড়ানো।

এদিকে শুধু গুজব সন্ত্রাস করেই রাষ্ট্র কিংবা সমাজকে অনিরাপদ করে তোলা না, ফেসবুকে নানা ধরনের গ্রুপ তৈরি করে সেগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে সমাজে কিশোর অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে আশংকাজনকভাবে। আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এ বিষয়ে অনেক তৎপর থাকলেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি দেশে ঘটে যাওয়া নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বেশিরভাগের পেছনেই কিশোররা জড়িত। এমনকি বরগুনার আলোচিত রিফাত হত্যাকাণ্ডের পেছনেও ফেইসবুক কেন্দ্রিক কিশোর গ্যাং এর সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। আসলে অবাধ তথ্য প্রযুক্তির যুগে কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজের বড় একটি অংশ আশঙ্কাজনকভাবে জড়িয়ে পড়ছে নানা সাইবার ক্রাইমে। সাইবার ক্রাইম থেকে পরবর্তী সময়ে ঘটছে নানা ধরনের বড় বড় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, অনেক উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সন্তান অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও কিশোর অপরাধীদের সিংগভাগই হচ্ছে দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অপরাধ বিশ্লেষকদের মতে, দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা অপরাধের সাথে যুক্ত হয় পেটের দায়ে। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা সঙ্গদোষ, লোভ ও অভিভাবকের সঠিক পরিচর্যার অভাবে এবং উচ্চবিত্তের সন্তানরা সার্বিক পরিচর্যা ও যথাযথ নজরদারির অনুপস্থিতি এবং আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে নানা অপরাধের সাথে যুক্ত হয়। সন্ত্রাসী গডফাদাররা কিশোরদের দ্বারাই মূলত বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত করছে আর এসব অপরাধী বেপরোয়াভাবে হত্যা, অপহরণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে প্রতিদিনই বিভিন্ন অপরাধে অংশ নিচ্ছে। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভয়ংকর সন্ত্রাসীরা এদের নিয়ন্ত্রণ করছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এদের গ্রেফতার করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে দু'এক দল ধরা পড়লেও অধিকাংশই থেকে যাচ্ছে ধরা-ছোয়ার বাইরে। আর এসব কিশোর অপরাধীর সন্ত্রাসী গডফাদারদের তো স্পর্শ করা যায় না। তাঁরা সব সময়ই থাকেন নিরাপদে। একথা স্বীকার না করার উপায় নেই যে, সামাজিক অস্থিরতাসহ নানা কারণে শিশু-কিশোররা সন্ত্রাসী গডফাদারদের স্বার্থের গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপরাধ কিংবা সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ ধরণের অপরাধ শুধু জাতীয় সমস্যা না এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এ সমস্যা প্রতিরোধের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি আলাদা কমিশন গঠন করে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও সাইবার অপরাধ দমনের জন্য যুগোপযোগী আইন ও নীতিমালা প্রয়োজন। দরকার- সাইবার বা ভার্চুয়াল পুলিশ গঠনের এবং দেশব্যাপী কঠোর মনিটরিংয়ের। পাশাপাশি আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সর্বোপরি আমরা নানা পদক্ষেপ সামাজিকভাবে গ্রহণ করতে পারি। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করার জন্যও সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষাটা খুবই প্রয়োজন। কিভাবে এই মাধ্যমকে কেউ ব্যবহার করবে, সেটাও তাকে আগে শিখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার কিংবা গুজব সন্ত্রাস ঠেকাতে হলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেয়া নানা কঠোর পদক্ষেপ এর পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া সজাগ থাকা প্রয়োজন ব্যক্তি কিংবা পরিবার পর্যায়েও। তাহলেই হয়তো নিরাপদ হবে দেশ, নিরাপত্তা পাবে দেশের নাগরিক।

শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (পরশুরাম থানা)

চোরাইকৃত মোটরসাইকেল উদ্ধারপূর্বক মালিকের কাছে হস্তান্তর

ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দরিদ্র রিক্সা চালকের চুরি যাওয়া রিক্সা উদ্ধারপূর্বক হস্তান্তর

গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (হাজিরহাট থানা)

বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল উদ্ধারপূর্বক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আন্তঃজেলা মোটর সাইকেল চোর চক্রের তিন সদস্যসহ চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার

গাঁজা বিক্রয়কালে মাদক ব্যবসায়ী হাতে-নাতে গ্রেফতার

ইয়াবা উদ্ধারসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

মোঃ আব্দুলাহ-আল-ফারুক •

বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র, জনবহুল এবং উন্নয়নশীল একটি দেশ। এদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এবং জাতীয় জীবনের উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা শব্দটি ব্যাপকভাবে জড়িয়ে রয়েছে। শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে গড়ে তোলা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

ইংরেজরা আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলো তা কতিপয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। ইংরেজ শাসকরা এদেশে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলো, যার উদ্দেশ্য ছিলো একদল শিক্ষিত গোলাম ও প্রভুভক্ত লোক তৈরি করা, যারা জাতিগতভাবে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু মানসিকভাবে ইংরেজদের ধ্যান ধারণা পোষণ করবে। বৃটিশরা এদেশে শাসন ও শোষণ করতে এসেছিল। তাই এ দেশীয়দের মধ্য থেকে তাদের এমন একদল লোক প্রয়োজন ছিলো, যারা তাদেরকে প্রভু মনে করবে, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, চিন্তা দর্শনকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে এবং একান্ত বাধ্যানুগত দাসের ন্যায় দেশ পরিচালনার কাজে তাদের সেবা সহযোগিতা করবে। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে স্বতন্ত্র ও আদর্শ সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। পাকিস্তান আমলে হানাদার শাসকরা একাধিক শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য তৈরি করেছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের প্রথম সরকার কর্মকান্ড শুরু করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন-এর মাধ্যমে এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এই কমিশন ১৯৭৪ সালের ৩০ মে তাদের রিপোর্ট দাখিল করে। দেশের- সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। রিপোর্ট তৈরিতে সমসাময়িক বিশ্বের অন্যান্য দেশের অবস্থাও বিবেচনা করা হয়। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বাংলাদেশের নতুন প্রণীত সংবিধানের মৌলিক বিষয় প্রতিফলিত হয়েছিল।

দীর্ঘ সাড়ে চার দশকের পথচলায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। পাল্টে গেছে শিক্ষা-সংস্কৃতি। নতুনরূপে আবির্ভূত হয়েছে মানুষের চিন্তা-চেতনা। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে (http://www.moedu.gov.bd) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কাঠামোগতভাবে তিনস্তর বিশিষ্ট- প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর। সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখে।

সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বিস্তারের জন্য পরিচালিত হয়। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কলেজ হিসেবে পরিচিত। প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর মেয়াদী । মাধ্যমিক শিক্ষা ৭ বছর মেয়াদী (এর মধ্যে ৩ বছর জুনিয়র ও ২ বছর মাধ্যমিক

এবং ২ বছর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দশটি (১০) শিক্ষা বোর্ডে অধিভুক্ত। বোর্ডগুলো তিনটি পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করে: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই অনুমোদন, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশে তৃতীয় পর্যায়ে বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ৩-৫ বছর মেয়াদি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ৩৬টি পাবলিক ও ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত কলেজের মাধ্যমে এ শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা বা ইংরেজি ভাষার মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে পারে। বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় হলো শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দফতর। এর অধীন কয়েকটি অধিদপ্তর রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প (শিক্ষা প্রকল্প ও কারিগরি প্রকল্প)'র মাধ্যমে এ অধিদপ্তরসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে রয়েছে মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। এগুলো যথাক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবং বিদেশি শিক্ষা বোর্ডের তালিকাভুক্ত। মাধ্যমিক পরবর্তী পর্যায়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুল পরিচালনার জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গঠিত পৃথক পৃথক শিক্ষা কমিশন থেকে পাওয়া তথ্য ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একটি শিক্ষানীতি প্রকাশ করেছে। সরকার 'বাংলাদেশ বুর্যো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (ব্যানবেইনস) গঠন করেছে, যা সব পর্যায়ের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ করে। এছাড়াও 'অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো' এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে অনেক অলাভজনক সংগঠন রয়েছে, যারা সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য অনানুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর ওয়েব সাইট (http://www.shed.gov.bd) এ প্রকাশিত শিক্ষা কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক এই তিনটি প্রধান ধাপে বিভক্ত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি ৫ বছর, যা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন, মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি ৭ বছর যা তিনটি উপধাপে বিভক্ত যথা নিম্নমাধ্যমিক ৩ বছর, মাধ্যমিক ২ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর। প্রাথমিকে প্রবেশের বয়স ৬ বছর, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের বয়স যথাক্রমে ১১-১৩, ১৪-১৫ এবং ১৬-১৭ বছর। ডিগ্রি এবং মাস্টার্স পর্যায়ের-সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি, প্রকৌশলী, কৃষি ও ব্যবসায় শিক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিকের অনুসরণে করা হয়। সাধারণ শিক্ষায়- উচ্চ মাধ্যমিককে অনুসৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা- পাস অথবা অনার্স ডিগ্রি কোর্স (৪ বছর) দিয়ে শুরু হয়। মাস্টার্স কোর্স ডিগ্রী- অনার্স ডিগ্রী প্রাপ্তদের জন্য ১ বছর এবং ডিগ্রি পাস শিক্ষার্থীদের জন্য ২ বছর। এছাড়া কারিগরির আওতায় উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিকের পর থেকে শুরু হয়। প্রকৌশল, ব্যবসা, চিকিৎসা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র। চিকিৎসা শিক্ষা ৫-৬ বছর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়,অধীন দপ্তর / সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর তথ্য ভান্ডার (http://www.shed.gov.bd) থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারনা পাওয়া যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণ ও মাদ্রাসা এ দুই প্রধান ধারায় পরিচালিত। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা এ তিনটি ধারায় পরিচালিত। উচ্চ শিক্ষাও তিনটি ধারায় পরিচালিত। সাধারণ (বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান, কলা, ব্যবসায় শিক্ষা ও সামাজিক বিজ্ঞান), মাদ্রাসা এবং টেকনোলজি শিক্ষা। টেকনোলজি শিক্ষার মধ্যে কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, টেক্সটাইল, লেদার এবং আইসিটি অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ শিক্ষার মত মাদ্রাসা শিক্ষায়ও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে একই ধরনের বিষয় পড়ানো হয় তবে ধর্মীয় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তদারকির জন্য বিভিন্ন সহায়ক সংস্থা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, জাতীয়

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি), শিক্ষা বোর্ড, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট প্রভৃতি।

প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও প্রতিশ্রুতি নির্ভর বিশ্বের উপযোগী জনসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকার তথ্য প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণাটিকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশ, সকলের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থান গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (ICT Division) এ বিষয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ পরিচালিত Learning and Earning Development Project এর কথা উলেখ করা যায়। আত্মকর্মসংস্থান ও অনলাইন আউটসোর্সিং বৃদ্ধিকল্পে ফ্রিল্যান্সারদের প্রশিক্ষণ প্রদানই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক / উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার-মধ্য আয়ের, দ্রুত উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল একটি দেশ। প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক হাজারো বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে কাঠামোগত রূপ পাচ্ছে। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের সদিচ্ছা ও চেষ্টার কোন কমতি নেই। তাই সঙ্গত কারণেই শিক্ষার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের কাজটি সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রচুর পরিমাণ সাফল্য ও অর্জন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু অপর্যাপ্ততা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দারিদ্রতা, শিক্ষক স্বল্পতা, মান সম্পন্ন শিক্ষা উপকরণের সঙ্কট, সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ এর মধ্যে উলেখযোগ্য।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য কেবল অর্থের যোগানই নয় বরং পর্যাপ্ত সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষানীতির যথাযথ বাস্তবায়নের অবকাঠামোগত কাজগুলো সম্পন্ন করে শিক্ষকতা পেশাকে সমাজে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাধান্য দেয়া নিশ্চিত করে যাবতীয় কোচিং ব্যবস্থা বন্ধ করা সময়ের দাবী। নৈতিক শিক্ষা, মূল্যবোধের চর্চা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক বিনোদনের ব্যবস্থা করা জরুরী। নামমাত্র ডিগ্রী অর্জন এবং পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও করণীয় রয়েছে। শিক্ষিত ও সচেতন মানুষকে তার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বগুলো পালন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা করতে বাধ্য না করে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী করে তোলা উচিৎ। সর্বোপরি শিক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি এবং শিক্ষার নামে বাণিজ্য কোনভাবেই যেন প্রশ্রয় না পায় সে ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরতাই টেকসই সমাজ গঠনের মূল চালিকাশক্তি। দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির জন্য সরকারের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিকের উদ্যোগী হওয়া উচিত। শতভাগ শিক্ষা এবং উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে তবেই বাংলাদেশ সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (হেঃ কোঃ)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ-এ ডিজিটালাইজেশন

নাদিয়া জুঁই •

ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়; একটি স্বপ্ন; একটি দর্শন। এই দর্শনের মধ্যে রয়েছে জনগণের কাছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। সর্বোপরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাগরিকদের সরকারি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। প্রতিটি সেবার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার সেবা প্রদান ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং কাজে সচ্ছতা বাড়াবে। সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়ন হবে।

স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে প্রথম প্রতিরোধ করেছিল বাংলাদেশ পুলিশ। দেশের জন্য রক্ত দিয়ে পুলিশ বাহিনী স্বাধীন দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্রত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা, সততা ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বিভিন্ন ডিজিটালাইজড সেবা প্রদান করছে বাংলাদেশ পুলিশ।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সেবার মান বৃদ্ধি, দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান, অভ্যন্তরীণ কাজে গতিশীলতা ও শৃঙ্খলা আনয়নে ডিজিটালাইজেশনের বিকল্প নেই। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নবগঠিত ইউনিট হিসেবে সৃষ্টির শুরু থেকেই ডিজিটালাইজেশন এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সৃষ্টির শুরু থেকেই আরপিএমপি-র ফেসবুক পেজ চালু, whatsapp এ কমিশনারসহ সকল অফিসারদের সংযুক্তি, ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন, CDMS এর মাধ্যমে মামলার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন, সিসি টিভি মনিটরিং, রংপুর মেট্রোপলিটন এর নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু, মিডিয়া সেল এর মাধ্যমে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং Digital Finger Print Door স্থাপনসহ বিদ্যমান পুলিশের অফিস ব্যবস্থাপনার সকল এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

সিটি কর্পোরেশনের সিসি ক্যামেরার সাথে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কন্ট্রোল রুমের সংযোগ (Access) স্থাপন:

রংপুর মহানগরের আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গত ১৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে স্থাপিত CCTV এর সাথে রংপুর মহানগর পুলিশের সংযোগ সাধিত হয়। সিসি ক্যামেরার সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও মেট্রোপলিটন পুলিশ যৌথভাবে বিভিন্ন অপরাধ নিয়ন্ত্রণসহ সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন ও যানজটমুক্ত মহানগর প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে।

CDMS (Crime Data Management System):

CDMS সফটওয়ার বাংলাদেশ পুলিশের যুগান্তকারী একটি উদ্যোগ। মামলা রুজু থেকে শুরু করে মামলার প্রতিটি স্তরের কার্যক্রম CDMS এর মাধ্যমে করা হয়। আরপিএমপির মামলাসমূহের যাবতীয় কার্যক্রম CDMS এর মাধ্যমে করা হচ্ছে।

অনলাইন ভিত্তিক পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন :

নগরবাসীকে স্বল্পসময়ে স্বচ্ছতার মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ২২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ থেকে সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। পূর্বে নগরবাসীকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতে থানা, উপ-পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় এবং পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে যেতে হতো যা ছিল অনেক সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। এখন রংপুর মেট্রোপলিটনের সম্মানীত নগরবাসী সহজেই এ সেবা পাচ্ছেন। এমআরপি সফটওয়্যারের সাথে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের access থাকায় পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন এর ট্র্যাকিং সুবিধা গ্রাহক সহজেই পাচ্ছেন।

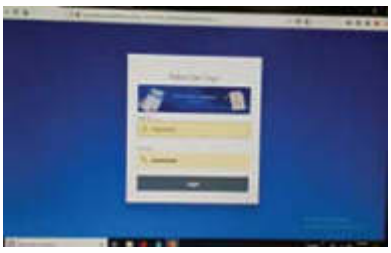

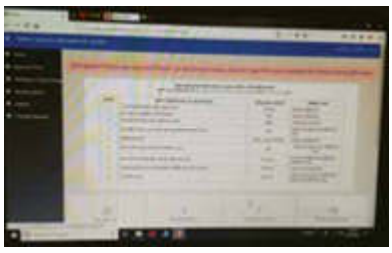

পুলিশ কমিশনারের অফিসের সাথে প্রতিটি ইউনিটের নিবিড় পর্যবেক্ষনের জন্য CCTV সংযোগ:

রংপুর মেট্রোপলিটনের প্রতিটি ইউনিটে CCTV ক্যামেরা স্থাপনের পাশাপাশি সকল থানা ইউনিটসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশনার অফিসের সাথে সকল ইউনিটের CCTV এর সংযোগ দেয়া হয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের নিজস্ব Website চালুকরণ:

উদ্বোধনের স্বল্পসময়ের মধ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ৩০ শে জুন ২০১৯ খ্রিঃ মাননীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ সফরকালে এ ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নগরবাসী সহজেই রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ সম্পর্কে জানতে পারছেন।

সেবাসমূহের পরিচিতি, সেবা প্রাপ্তির উপায় এবং উপকরণ সম্বলিত ওয়েবসাইট www.rpmp.gov.bd নতুন আঙ্গিকে তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করে তৈরি করা হয়েছে। সেখানে রয়েছে সিটিজেন চার্টার ও কর্মরত সকল অফিসারের নাম, ফোন নম্বর এবং ই-মেইল সম্বলিত তালিকা। এছাড়াও সেবা সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য বা অভিযোগ প্রদানের সুযোগ এ ওয়েবসাইটে রয়েছে।

আরপিএমপি-র facebook পেইজ চালুকরণ:

আরপিএমপি ফেসবুক পেইজ নাগরিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, নাগরিকদের নিরাপত্তা টিপস্ প্রদান, আরপিএমপির সফলতা সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে নগরবাসীকে শুভেচ্ছা প্রদানসহ রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী সময়ে সময়ে জনস্বার্থে পুলিশ কমিশনার কর্তৃক করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান, নাগরিকদের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

পুলিশ কমিশনার থেকে ইন্সপেক্টর পর্যন্ত Whats App গ্রুপ এ সংযুক্তি:

তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে তথ্যের দ্রুততম সরবরাহ ও যোগাযোগের একটি মাধ্যম হলো হোয়াটস অ্যাপ নামক এই ম্যাসেঞ্জার। আরপিএমপির পুলিশ কমিশনার থেকে ইন্সপেক্টর পর্যন্ত Whats App গ্রুপ এ সংযুক্তির ফলে একযোগে সকল তথ্য আদান প্রদান, বিভিন্ন নির্দেশ দ্রুততার সাথে সরবরাহসহ ছবি আদান-প্রদান, অডিও ও ভিডিও বার্তা আদান প্রদান করা যায়। এতে করে কাজে গতিশীলতা তৈরি হয়।

CIMS (Cityzen Information Mangment System):

CIMS Software এর মাধ্যমে রংপুর মহানগরীর প্রতিটি থানার আওতাধীন বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের তথ্যাদি এন্ট্রিপূর্বক সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাড়িওয়ালা, ভাড়াটিয়া এবং মেস সদস্যদের তথ্য আলাদাভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে। তথ্যের চাহিদার ধরণ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। নগর বিশেষ শাখা ইতোমধ্যে কাজটি শুরু করেছে।

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, পাসপোর্ট ও চাকুরীর ভেরিফিকেশন, অপরাধী সনাক্তকরণ, নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের অবস্থান চিহ্নিতকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা যাবে।

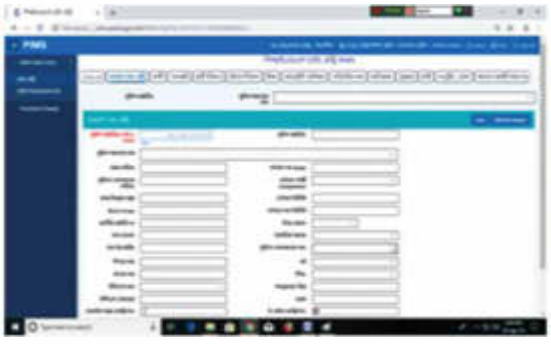

CIMS (Cityzen Information Mangment System)

PIMS (Personnel Information Management System):

বাংলাদেশ পুলিশের ডিজিটাল আর্কাইভ-PIMS। এই সফটওয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্যদের যোগদান (পদবীসহ), বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, পারিবারিক তথ্য, অভিজ্ঞতা, পুরস্কার, শাস্তি, সংযুক্তি/প্রেষণ এবং জরুরী প্রয়োজনীয় নাম্বার সমূহের তথ্যাদি এন্ট্রি দেয়া হয়।

এ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের র‍্যাংক ভিত্তিক সদস্যদের পরিসংখ্যানও পাওয়া যায়। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি সদস্যের সকল তথ্য PIMS এ আপডেট করা হচ্ছে।

ORP (organization resource planning)

বাংলাদেশ পুলিশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে organization resource planning (ORP) software phase-1 & 2 সফটওয়্যার প্রস্তুত রয়েছে।

ORP সফটওয়্যারটির ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পুলিশ সদস্যরা নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের ডাটা এন্ট্রি দিয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য ডাটাসমূহ হল-

১. সংশিষ্ট ইউনিট সমূহের ডি-স্টোর, সি-স্টোর, ষ্টেশনারী সংশিষ্ট মালামাল ক্রয়ের স্মারক নাম্বার software (PURCHAING PART-1) এন্ট্রি।

২. বিতরণকৃত ও মালামালসমূহের স্মারক নাম্বার অনুযায়ী Inventory এ Part Entry।

এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সি-স্টোর ও ডি-স্টোরের স্টকের পরিমাণ, ঘাটতিসহ কোনো মালামলের চাহিদা দেয়া হয়ে থাকলে তার অবস্থান জানা যায়।

BMS software:

বাংলাদেশ পুলিশের ভবন নির্মাণ, মেরামত ও জমি সম্পর্কিত তথ্য এন্ট্রি ও সংরক্ষনের জন্য Building and Land Management Database Software রয়েছে। উক্ত ডাটাবেজ সফটওয়ারে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ভবন নির্মাণ, মেরামত ও জমি সম্পর্কিত তথ্য এন্ট্রি হচ্ছে। সময়ে সময়ে উক্ত তথ্য হালনাগাদকরণ হচ্ছে।

প্রত্যেকটি স্থাপনার নূন্যতম ২৫টি ছবি বাহির হতে (দূর ও নিকট হতে চতুর্দিক থেকে) তুলে ডাটাবেজে এন্ট্রি করা হয়। এতে করে সরকারী স্থাপনা সমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব।

e-Traffic prosecution and fine payment system:

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিটে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ট্রাফিকিং ব্যবস্থাপনার জন্য গত ১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ 'e-Traffic prosecution and fine payment system" কার্যক্রম শুরু হয়। ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন ব্যবস্থাপনায় POS মেশিন (Point of Service) এর মাধ্যমে জনগণকে হয়রানির হাত থেকে বাঁচিয়ে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য মোটরযান আইনে মামলা রুজু এবং সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা আদায় করে কাগজপত্র ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটনে চালু করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারনেট ভিত্তিক ট্রাফিকিং সেবা। যা নবসৃষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি অন্যতম সাফল্য ।

Digital Finger Print Door & Help Desk:

সম্প্রতি কমিশনার কার্যালয়ের গেটে ডিজিটাল ফিঙ্গার প্রিন্ট ডোর স্থাপন করা হয়েছে। পূর্বে এন্ট্রি ডোর না থাকায় কে বা কারা অফিসে আসছেন বা অফিস ত্যাগ করছেন তা পুরোপুরি জানা যেতনা।

এখন ডিজিটাল ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে এবং সিসিটিভির অফিসার ও দর্শনার্থীদের অফিসে আগমন ও প্রস্থানের সময় নির্ধারণ করা যায়। ডিজিটাল ডোর সম্বলিত হেল্পডেস্কে যেকোন দর্শনার্থী এসে তাদেন নাম এন্ট্রি করে।

তথ্য প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনধারাকে উন্নত করাই হচেছ ডিজিটাল বাংলাদেশের মূলমন্ত্র। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল সরকারি সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকারী অফিস/দপ্তরসমূহকে ডিজিটালাইজেশনের পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন। পাশাপাশি নিজস্ব অফিস/দপ্তরসমূহের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন যাতে করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। তারই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পুলিশের সর্বকনিষ্ঠ ইউনিট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ জনসেবায় এবং নিজস্ব অফিস ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে চলেছে।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্যাট্রোল)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (গোয়েন্দা শাখা)

রমেক থেকে চুরি যাওয়া নবজাতক শিশু উদ্ধার

২,০০০ (দুই হাজার) পিচ ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

সংঘবদ্ধ মুক্তিপণ চক্রের সদস্য গ্রেফতার

দেশীয় জাল টাকা ও ভারতীয় জাল রুপীসহ আসামী গ্রেফতার

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (ট্রাফিক বিভাগ)

ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন

পথচারী পারাপারের সহযোগিতায় ট্রাফিক পুলিশ

ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশনে মটরযান আইনে মামলা দেয়া হচ্ছে

ট্রাফিক দক্ষিণ বিভাগের শুভ উদ্বোধন

‘বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নাও তোমরা’

উমর ফারুক ●

২০১৮ সাল, ফেব্রুয়ারির মাঝামঝি। শীত ও কুয়াশা তখনো পুরোপুরি বিদায় নেয় নি। ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল সাড়ে ন’টা ছুঁইছুঁই। মাহিগঞ্জ বাজার, রংপুরএ সোনালী ব্যাংকের সামনে স্বপন স্টোর। মুদিখানা দোকান। দোকানের মালিক স্বপন রায় তখন চায়ের কাপ পরিষ্কার করছেন। দুটো কাপ। একটা তার জন্য, অন্যটা পেয়ারা স্যারের জন্য। পেয়ারা স্যার মানে মীর আনিসুল হক পেয়ারা, যিনি এলাকায় স্যার নামেই বেশি পরিচিত, একজন ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা। স্বপন রায় চায়ের দোকানদার নয়। পেয়ারা স্যারের সাথে দিনে দু-বার দু-কাপ চা পান করেন। সকাল সাড়ে ন’টা ও বিকেল সাড়ে চারটা। আয়োজনটা সে জন্য। ইলেক্ট্রিক পাত্রে পানি ততোক্ষণে প্রায় উষ্ণ। জানতে চাইলাম, পেয়ারা স্যার কখন আসবেন? বললেন, মিনিট দুয়েকের মধ্যে। জানালেন, উনি খুব সময় মেপে চলেন। ঘড়ির কাঁটায় চলে তার জীবন। খুব ছন্দময়তায় ভরা, কোনো পতন নেই তাতে। ভাষা আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত, কোথাও কোনো ছন্দপতন নেই। প্রতিদিন আমার দোকানে এককাপ চা পান করে পাড়ি জমান শহরে। জজকোর্টের সামনে অধিকার চেম্বারে বেলা ১২টা পর্যন্ত আড্ডা দেন। বাসায় ফিরে ইবাদত ও আহার সেরে বিশ্রাম নেন। তবে দিবা ঘুমের কোন অভ্যেস নেই তার। বই পড়েন। পত্রিকার পাতা উল্টোন। বিকেলে আবার ইবাদত শেষে, আমার দোকানে। আবার এককাপ লাল চা। এটা তাঁর প্রায় ১০বছরের সূচি। খুব ব্যতিক্রম না হলে এতে কোনো পরিবর্তন আসে না।

ততক্ষণে ঘড়িতে সাড়ে ন’টা। রিক্সা থেকে নামলেন পেয়ারা স্যার। চেহারায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আলো ঝলমল করছে। গায়ের রঙ টকটকে সাদা। চোখে চশমা, পায়ে জুতো। পাঞ্জাবির উপর হালকা সোয়েটার পরা। সে পোশাক চকচক করছে। এই বয়সেও সবকিছু কেমন অসাধারণ স্বাভাবিকতায় ভরা। শুধু স্মৃতিটা আর আগের মতো নেই। ভালো মনে থাকে না। কখনো কখনো অল্পতে রেগেও জান। আমাকে চিনিয়ে দিলেন স্বপন দাদা। দোকানে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলতে শুরু করলেন তাঁর জীবনের গল্প। ৫২’র গল্প। ৭১’র গল্প।

মীর আনিসুল হক পেয়ারার জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালে তার বয়স ছিল মাত্র ১৬বছর। ৪৯-এ পড়তেন রংপুর জেলা স্কুলে। ভাষা আন্দোলনের জন্য বহিস্কার হন। রংপুর আদর্শ স্কুল থেকে শেষ করেন মাধ্যমিক। ১৯৫২ সালে ছিলেন কারমাইকেল কলেজের ছাত্র। সে সময় চারদিক ছিল থমথমে। স্কুল, কলেজ থেকে ছাত্রদের বের করে এনে মিছিল করতেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন শাহ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও মোহাম্মদ আফজাল হোসেন। রংপুরে ভাষা আন্দোলনে আরও অনেকে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। কিছু নাম তিনি বলার চেষ্টা করছিলেন। সিদ্দিক হোসেন, ডা: রোকেয়া আলমগীর, বনয় সেন, মজিবর রহমান মতি, ডা: শোভান খান, ডা: দীনেশ চন্দ্র ভৌমিক, মকবুল হোসেন, আফান উল্লাহ, ডা: কবির খান বখতিয়ারি, এ্যাডভোকেট গাজী রহমান, কামরান শাহ আবদুল আউয়াল, অধ্যাপক রেজা শাহ তৌফিকুর রহমান, এ্যাডভোকেট আবদুস সালামসহ আরও অনেকেই সে সময় আমাদের ভাষার জন্য আন্দোলন করেছেন।

আরও বিস্তারিত গল্প শুরু করলেন পেয়ারা স্যার। বললেন, রংপুরে ভাষা আন্দোলন সূচিত হয় ১৯৪৮ সালের মার্চে। ধর্মঘট, সভা-সমাবেশ, মিছিল ও পোস্টারে প্রকাশ পেতে থাকে আন্দোলন। কারমাইকেল কলেজ হয়ে ওঠে এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু, সুঁতিকাগার। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, পুরো

সময় জুড়ে রংপুরে চলে সেই আন্দোলন। কারমাইকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন শাহাব উদ্দিন। তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। সার্বক্ষণিক পাইপ টানতেন। রংপুরে ভাষা আন্দোলনের মূল বিরোধিতাকারী ছিলেন এই শাহাব উদ্দিন। তিনি ছাত্রদের মিছিল, সভা-সমাবেশ করতে দিতেন না। কোথাও কোন দেয়াল লিখন কিংবা পোস্টার দেখা মাত্র তুলে ফেলার নির্দেশ দিতেন।

১৯৫২ সালে মীর আনিসুল হক পেয়ারা-সহ আরও কয়েকজন মিলে, রংপুর টাউন হলের পাশে, কাদামাটি দিয়ে একটি অস্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করেন। ওটা ছিল দক্ষিণমুখি। পরবর্তী সময়ে ওখানে স্থায়ী একটি শহিদ মিনার তৈরি করা হয়। কথাগুলো বলতে বলতে, পেয়ারা স্যার খানিকটা আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন। বললেন, আমার সহযোদ্ধারা কেউ আর সক্রিয় নেই। কেবল আমি ছাড়া। কেউ অসুস্থ, আবার কেউ গ্রামে চলে গেছে। শুধু আমি এখনও নিজে নিজে সামান্য চলতে পারি। আনিসুল হক পেয়ারা একসময় তুখোড় স্কাউট ছিলেন। প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়া স্কাউট। আফান উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। সাহিত্য সংগঠন করেতেন। রাজনীতি করেতেন। রসিকতাও করতে পারেন এখনও। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি কোথায়? সাতক্ষীরা শুনেই মজা করে বললেন, সাতক্ষীরা থেকে একক্ষীরায়? মাঝখানে ছয়ক্ষীরা নেই। আনিসুল হক পেয়ার এখনও শিশুর মতো সরল। ছোট্ট শিশু অক্ষরের সাথে খেললেন কিছুক্ষণ। খাবার দিলেন। বললেন, আপু নাচো তো। আর তিনি গাইলেন, নাচ ময়ূরী নাচ রে। আনিসুল হক পেয়ারার পাঁচ সন্তান। চার মেয়ে শিক্ষকতা করেন। ছেলেটা ব্যবসায়ী। সরকার ভাতা দেয়। তাতেই তার বেশ চলে। গায়ের জামাটা জন্মদিনে মেয়ে উপহার দিয়েছে।

১৯৫২ সালে আনিসুল হক পেয়ারার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। সে সময় তিনি পালিয়ে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধও তার কাছে এক অসামান্য গৌরবগাঁথা। তিনি বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশ তার ঠিক পথেই চলছে। কথার এক পর্যায়ে, মরহুম সাংবাদিক ইকবাল ভাই ও হাশেম ভাই তাকে মাহিগঞ্জ প্রেসক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ডেকে নিয়ে গেলেন। পেয়ারা স্যার তখনও একাই চলতে পারতেন। তবে চলার গতি ছিল ধীর। উঠেই দেখলেন রাস্তার মাঝে কিছু ময়লা পড়ে আছে। আনিসুল হক পেয়ারা নিজ হাতে সেই ময়লা পরিষ্কার করলেন। বৃদ্ধ মানুষ। কিন্তু দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পরিবেশের প্রতি তিনি এখনও দায়িত্বশীল, যত্নশীল। এটাই আনিসুল হক পেয়ারা। এঁরাই আমাদের ভাষা সৈনিক। এঁরাই আমাদের মুক্তিযোদ্ধা। যাঁরা আমাদের জন্য ভাষা এনেছেন, স্বাধীনতা এনেছেন। তারা এখনও তাদের দায়িত্বের জায়গায় খুবই স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন।

পথ চলতে চলতে, ভাষাসৈনিক আনিসুল হক পেয়ারাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তরুণদের কাছে কী চাওয়ার আছে আপনার? তিনি হঠাৎ থমকে গেলেন। তারপর বললেন, বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নাও তোমরা। আরও। আরও অনেকটা পথ।

বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। দৃপ্ত পায়ে, দীপ্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা সৈনিকদের দেখানো পথে এগিয়ে চলেছে। আমার সাথে শেষ দেখার মাত্র দেড় বছরের ব্যবধানে ভাষা সৈনিক আনিসুল হক বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা তাঁর সুস্থতা কামনা করি।

শিক্ষক
অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
ই-মেইল: faruque1712@gmail.com

নিরাপদ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অপরিহার্য

মোঃ ফারুক আহমেদ ●

সড়ক দূর্ঘটনার ফলে প্রতিবছর ঝরে যাচ্ছে শত শত সম্ভাবনাময় প্রাণ এবং আহত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। অনেক ব্যক্তি ও পরিবার সড়ক দুর্ঘটনার গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছে যুগের পর যুগ। বাংলাদেশের সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যে কতটা নাজুক তা সড়ক দূর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের দিকে আলোকপাত করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত সাড়ে তিন বছরে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে ২৫ হাজার ১২০ জন। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ২০ জন। এই সময়ে আহত হয়েছে ৬২ হাজার ৪৮২ জন। এসব দুর্ঘটনার ৯০ শতাংশ ঘটেছে চালকের বেপরোয়া মনোভাব ও অতিরিক্ত গতির কারণে (প্রথম আলো, ০৪/০৮/২০১৮)।

দেশে বড় কোন সড়ক দুর্ঘটনা হলেই আমরা শুধু চালকদের একতরফাভাবে দায়ী করেই আমাদের দায়িত্ব শেষ করি। প্রকৃতপক্ষে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিরাপদ, আস্থাপূর্ণ ও স্থিতিশীল করার জন্য দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার বিদ্যমান সমস্যার গভীরে যেতে হবে। গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সড়কগুলোতে অহরহ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার মূল কারণ। প্রকৃতপক্ষে কারা দুর্ঘটনার জন্য দায়ী? কোন পেশার লোক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী? কোন ব্যবস্থা/সিস্টেম এর জন্য দায়ী? কোন কোন প্রতিষ্ঠান এর জন্য দায়ী? এক্ষেত্রে পথচারী বা সাধারণ জনগণের কোনো দায় রয়েছে কিনা? দেশে নিরাপদ সড়ক বা নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর উত্তর জানাটা অত্যন্ত জরুরী। আসুন আমরা দেখে নেই নিরাপদ সড়ক বা যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের পথে কে বা কারা কিরূপে দায়ী এবং কিভাবে এই বৃহৎ জাতীয় সমস্যার সমাধান করা যায়।

দেশে ডাক্তার তৈরি করার জন্য মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষিত জাতি, ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-গবেষক তৈরি করার জন্য সাধারণ এবং কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে হলেও এটাই সত্যি যে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র-শিক্ষক, বিজ্ঞানী-গবেষক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদসহ জনসাধারণকে বহনকারী গাড়ির ড্রাইভার তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সেন্টার/ইনস্টিটিউশন নেই। এর ফলে অমিত সম্ভাবনাময় ছাত্র-তরুণ এবং বিপুল অর্থ ও বছরের পর বছর সময় বিনিয়োগ করে তৈরী করা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র-শিক্ষক, লেখক-গবেষক-বিজ্ঞানী, শিল্পী ও রাজনীতিবিদরা অঘোরে রাস্তায় প্রাণ হারাচ্ছে অদক্ষ, অযোগ্য ও অপেশাদার চালকদের বেপরোয়া এবং খামখেয়ালিপনা ড্রাইভিং এর কারণে। ফলে জাতি হারাচ্ছে মূল্যবান মেধাসম্পদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ।

শুধুমাত্র ২০১৯ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ হাজার ২২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৫ হাজার ৪৬৬ জন। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির এক পরিসংখ্যানে এই তথ্য উঠে এসেছে (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫/০১/২০১৯)। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০১৯ সালে ৫ হাজার ৫১৪টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ৭ হাজার ২২১ জনের মৃত্যু হয়। সড়কে যাদের প্রাণ গেছে, তাদের মধ্যে ৭৮৭ জনই নারী। আর ৪৮৭ জন শিশু। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে এক হাজার ২৫২ জন চালক ও শ্রমিক, ৮৮০ জন শিক্ষার্থী, ২৩১ জন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ১০৬ জন শিক্ষক এবং ৩৪ সাংবাদিক রয়েছেন। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে রেলপথে ৩৭০ টি দুর্ঘটনায় ৩৯৪ জন নিহত ও ২৪৮ জন আহত হয়েছেন। আর নৌপথে ১৫০টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১২৬ জন। আহত হয়েছেন ২৩৪ জন। ৩৮৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই শিশু, তরুণ ও কর্মক্ষম ব্যক্তি। এই দুই শ্রেণিকে দেশের ভবিষ্যৎ ও অর্থনীতির মূল শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনা এবং এর প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা (সূত্র: বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি ও এআরআই, বুয়েট)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৫ সালের এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে- সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩ তম। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির দিক থেকে এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। বাংলাদেশের ওপরে আছে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। কিন্তু এই দেশগুলোর প্রতিটিতে যানবাহনের সংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি।

এছাড়াও ড্রাইভিং পেশার সম্মানজনক স্বীকৃতি না থাকায় সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও ভালো পরিবারের সদস্যরা এই পেশায় সম্পৃক্ত হচ্ছে না। কোন শিক্ষিত বেকার তরুণ ও যুব সমাজও এই পেশায় আসার আগ্রহপ্রকাশ করছে না। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিরপাদ ও টেকসই করার জন্য নীতি নির্ধারকদের কোন আন্তরিক ও দৃশ্যমান কোন উদ্যোগও নেই। ফলশ্রুতিতে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের পরিবহন ব্যবস্থা রয়ে গেছে ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। আমাদের দেশে হেলপার থেকেই বেশির ভাগ ড্রাইভার তৈরী হয়। অধিকাংশ ড্রাইভার ও পরিবহন শ্রমিকরা ওঠে আসে সমাজের নিম্নস্তর ও সুবিধা বঞ্চিত পরিবার থেকে। এদের অধিকাংশেরই নেই কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সচেতনতা। তাদের মধ্যে নিজেদের জীবনের গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে আত্ম-উপলব্ধি নেই। প্রতিটি জীবন যে অপার সম্ভাবনাময় ও অমূল্য সম্পদ এই বোধোদয় অধিকাংশ ড্রাইভার ও পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে নেই। অজ্ঞতা, কঠিন বাস্তবতা এবং নানা পারিবারিক ও সামাজিক ঘাত- প্রতিঘাতের ফলে জীবনকে তারা মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিতে পারেনি। এর ফলে নিজের জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার অভাবের কারণে তারা অন্যের জীবনের গুরুত্বও অনুধাবন করতে পারেননা। ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের সড়কে ড্রাইভার ও পরিবহন শ্রমিকদের নির্বিকার আচরণ, বেপরোয়া মনোভাব এবং অসুস্থ্য প্রতিযোগিতার কারণে অহরহ ঘটছে শত শত দূর্ঘটনা। এতে প্রাণ যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের। তাই সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও ভালো পরিবারের শিক্ষিত বেকার তরুণ ও যুবকদের ড্রাইভিং ও পরিবহন পেশায় আনার জন্য টেকসই ও যুগোপযোগী নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

নিরাপদ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তরায় /প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় করার আগে যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের (Stakeholders) চিহ্নিত করতে হবে। সড়ক, যানবাহন এবং দক্ষ চালক-পরিবহন খাতে শৃঙ্খলার তিন মূল নিয়ামক। কিন্তু এর কোনোটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। ফলে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আসছে না। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) তথ্যানুসারে, দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের ৬২ শতাংশে যথাযথ সাইন-সংকেতের ব্যবস্থা নেই। জাতীয় মহাসড়কের অন্তত ১৫৪ কিলোমিটার মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। আর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) হিসাব বলছে, দেশে ৩৮ লাখ যানবাহন চলছে। এর মধ্যে ফিটনেসবিহীন যানবাহনের সংখ্যা ৫ লাখের কাছাকাছি। একই সূত্রমতে, দেশে বিভিন্ন শ্রেণির যানবাহনের জন্য চালক আছেন প্রায় ২০ লাখ। অর্থাৎ ১৮ লাখ যানবাহন 'অবৈধ' চালক দিয়ে চলছে। অর্থাৎ ৪৭ শতাংশের বেশি গাড়ি চলছে 'অবৈধ' চালক দিয়ে। দেশের বিদ্যমান যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অংশীজন (Stakeholders) ও উপাদানসমূহ হলো-

১. যানবাহন ২. গাড়ী চালক ৩. রাস্তা ৪. পরিবহন শ্রমিক (সুপারভাইজার, হেলপার) ৫. পরিবহন মালিক ও পরিবহন শ্রমিক সমিতি ৬. যাত্রী ৭. পথচারী ৮. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৯. পরিবহননিয়ন্ত্রণ সংস্থা - বিআরটিএ, জেলা প্রশাসন ১০. সড়ক নির্মাণ ও তত্ত্বাবধানকারী সংস্থা- সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ), সেতু বিভাগ, এলজিইডি ইত্যাদি।

উল্লিখিত স্টেকহোল্ডারদের গাফিলতি বা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করার ফলেই দেশের সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। নিরাপদ সড়ক ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে উপর্যুক্ত স্টেকহে-াল্ডারদের থেকে উদ্ভূত প্রধান অন্তরায়/ কারণ/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

গাড়িচালক ও পরিবহন শ্রমিক সংক্রান্ত কারণ

- দক্ষ গাড়িচালক (ড্রাইভার) এর অভাব
- অদক্ষ ও লাইসেন্সবিহীন চালক নিয়োগ
- বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো
- চালকের মনোযোগ বিচ্যুতি
- ওভারটেকিং
- নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রেখে গাড়ি চালানো (দুই গাড়ি মাঝের দুরত্ব)
- মাদক সেবন
- ট্রাফিক আইন মেনে না চলা
- চালকদের অতিরিক্ত সময় ধরে বিরামহীনভাবে গাড়ি চালানো
- মোবাইলে কথা বলা
- দূরপাল্লার গাড়িগুলোতে বিকল্প ড্রাইভার না থাকা।
- বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ না থাকা
- নিম্ন মজুরি
- ড্রাইভিং ও পরিবহন সেক্টর সম্মানজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়া
- পরিবহন পেশায় শিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের অভাব
- চালক ও পথচারীদের সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব

যানবাহন সংক্রান্ত কারণ

- ফিটনেসবিহীন গাড়ি
- অনিবন্ধিত গাড়ি
- মেয়াদোর্ত্তীণ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন
- ফিটনেস সম্পন্ন ভালো মানের গাড়ির অভাব
- অতিরিক্ত মালামাল ও যাত্রী বোঝাই
- বিদেশ থেকে আমদানিকৃত গাড়িতে 'নকল' যন্ত্রপাতি লাগানো।
- সঠিক টায়ার ব্যবহার না করার কারণে চাকা ফেটে গিয়ে দুর্ঘটনা হয়।
- রাস্তায় অযান্ত্রিক ও অননুমোদিত গাড়ির চলাচল (ট্রলি, নসিমন, করিমন)
- মহাসড়কে ধীরগতির গাড়ির সমারোহ (অটোরিক্সা, রিক্সা)

রাস্তা ও অন্যান্যযোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত কারণ

- ত্রুটিপূর্ণ সড়ক ডিজাইন
- মহাসড়কের রাস্তার মাঝে ডিভাইডার না থাকা বা একমুখী যান চলাচলের ব্যবস্থা না থাকা
- লোকসংখ্যা ও গাড়ির তুলনায় অপর্যাপ্ত/ অপ্রশস্ত রাস্তা
- রাস্তার অতিরিক্ত, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক ও অন্ধ বাঁক (Blind Turn)
- অতিরিক্ত যানজট
- যানজটের কারণে ড্রাইভারদের ক্লান্ত ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা
- যানজটে ব্যয়িত সময় পুষিয়ে নিতে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর প্রবৃত্তি
- নিম্নমানের রাস্তা
- পর্যাপ্ত ওভারব্রিজের (পথচারী-সেতু) অভাব
- রাস্তায় অপর্যাপ্ত ট্রাফিক সাইন- সংকেত
- সড়ক পথের উপর অতি নির্ভরশীলতা

- রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সেবার মানেরউন্নতি না হওয়া
- নৌ-যোগাযোগ ও আকাশ পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তৃতি না ঘটা।

পরিবহনশ্রমিক ও মালিক সমিতি সংক্রান্ত কারণ

- পরিবহন মালিকদের অতি মুনাফা লাভের প্রবণতা
- পরিবহন মালিক/ শ্রমিকদের অপেশাদার আচরণ
- চাঁদাবাজি
- সিন্ডিকেট তৈরীর মাধ্যমে অযাচিত হস্তক্ষেপ
- ফিটনেসবিহীন, মেয়াদোর্ত্তীণ ও অনিবন্ধিত গাড়ী চালানো
- অযৌক্তিক ও অন্যায্য আন্দোলন/ অবরোধ

যাত্রী ও পথচারী সংক্রান্ত কারণ

- ট্রাফিক আইন মেনে না চলার প্রবণতা
- সচেতনতার অভাব
- ফুটঅভার ব্রীজ ব্যবহার না করা
- কানে হেডফোন/ মোবাইলে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হওয়া
- অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে ভ্রমণ
- তাড়াহুড়ো করার মনোভাব
- অতিরিক্ত মাল বোঝাই করা

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের (পুলিশ, বিআরটিএ, বিআরটিসি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) গাফিলতি সংক্রান্ত কারণ

- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাব
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব
- গাড়ির লাইসেন্স ও গাড়িচালকদের সনদ প্রদানে অনিয়ম ও দীর্ঘসূত্রিতা
- জটিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া
- দালালের দৌরাত্ম
- অনৈতিক সুবিধা আদায় ও ঘুষ বাণিজ্য

জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা সংক্রান্ত কারণ

- রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব
- জনগণের সচেতনতার অভাব
- সমন্বিত উদ্যোগের অভাব
- আইন মেনে না চলার সংস্কৃতি

আইন, বিধি ও নীতিমালা সংক্রান্ত কারণ

- নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরী সংক্রান্ত উপযুক্ত নীতিমালা না থাকা
- দূর্ঘটনা প্রতিরোধে কঠোর আইন না থাকা
- শাস্তির অপর্যাপ্ততা
- প্রচার প্রচারণার অভাব
- পাঠ্যক্রমে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরী সংক্রান্ত বিষয়ের অনুপস্থিতি

নিরাপদ সড়ক ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে করণীয়

নিরাপদ সড়ক ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য দেশের বিদ্যমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে এবং উপর্যুক্ত সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু, কার্যকরী ও টেকসই সমাধান করতে হবে। সেজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার। প্রয়োজন সারা দেশজুড়ে সড়ক, নৌ, রেল ও আকাশ পথে বহুমূখী উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যাতে করে যোগাযোগ ও মালামাল পরিবহনের জন্য সড়ক পথে অতি নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। সেইসাথে শিক্ষিত, দক্ষ ও আস্থাশীল ড্রাইভার তৈরীর লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমে নবম-দশম শ্রেণি থেকে কারিগরি ও ভোকেশনাল কলেজগুলোতে আলাদা ড্রাইভিং ট্রেড চালু করতে হবে। নিরাপদ সড়ক তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলা ও জেলাতে উন্নত মানের ড্রাইভিং সেন্টার/ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সকল ড্রাইভিং সেন্টার/ ইনস্টিটিউশন থেকে প্রতিবছর নূন্যতম ৫০০/১০০০ (পাঁচশ অথবা এক হাজার) করে শিক্ষিত/অধা-শিক্ষিত বেকার, তরুণ ও যুবকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ, পেশাদার, যোগ্য ও মানবিক গুণসম্পন্ন ড্রাইভার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে পর্যাপ্ত সুযোগ্য ও দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করা সম্ভব।

এছাড়াও ড্রাইভিং তথা পরিবহন সেক্টরে শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীকে আনার জন্য কারিগরি ও ভোকেশনাল স্কুল কলেজগুলোতে নবম শ্রেণী থেকেই আলাদা ড্রাইভিং ট্রেড খোলা যেতে পারে। এতে করে অপেক্ষাকৃত কম ভালো রেজাল্টের ছাত্রছাত্রীরা ড্রাইভিং এর মত বৃত্তিমূলক পেশায় কারিগরি ও ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। পরবর্তীতে এসএসসি পাশ করার পর তারা তাদের নিকটবর্তী উপজেলায়/জেলায় ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সেন্টারে পরীক্ষা দিয়ে ড্রাইভিং সনদ অর্জন করতে পারবে। ড্রাইভিং লাইন্সেস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণের সনদ অর্জনকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এভাবে দেশে পর্যাপ্ত শিক্ষিত ও দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করা যেতে পারে।

দেশের সরকারি ও বেসরকারি সকল পরিবহনে (বাস, ট্রাক, মিনিবাস, মাইক্রো, কার) নিয়োগের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ব্যবস্থায় পাস করা ড্রাইভারদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এভাবে দেশে পর্যাপ্ত শিক্ষিত ও দক্ষ ড্রাইভার তৈরি হলে তাদেরকে দেশের পরিবহন সেক্টরে নিয়োগের পাশাপাশি বিদেশেও দক্ষ ড্রাইভার হিসেবে রপ্তানি করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থায় একদিকে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সড়ক যেমন নিরাপদ হবে তেমনিভাবে দক্ষ ড্রাইভার প্রবাসে পাঠিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে। একটি দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার অন্যতম নিয়ামক হলো উন্নত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলেই নয় এ ক্ষেত্রে দক্ষ চালকও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দক্ষ চালকবিহীন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অকার্যকর। তাই বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নকে টেকসই করার লক্ষ্যে উন্নত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়। এ ব্যাপারে সকলের দায়িত্বশীল ও আন্তরিক ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের জরুরীভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

মানবতার সেবায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

মোঃ জমির উদ্দিন •

আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য হিসেবে মানবতার সেবায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ভূমিকা ও অর্জন সম্পর্কে উপস্থাপনার আগে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর প্রথম ও প্রধান কাজ সম্পর্কে আলোকপাত করছি। বাংলাদেশ পুলিশ এর দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো দেশে প্রচলিত আইন ও বিধির আলোকে দেশের আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি সম্পদসহ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম মহোদয়ের দিক নির্দেশনা ও নেতৃত্বে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে রংপুর মহানগর এলাকার মধ্যে ফৌজদারী অপরাধসহ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার অনেকাংশে কমে গেছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ পুলিশি টহল ব্যবস্থা জোরদার করায় শহরের লোকজন নিশ্চিত নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করছে। এক কথায় বলা যায় রংপুর মেট্রোপলিটন গঠনের পর হতে রংপুর মহানগর একটি শান্তির জনপদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ই-ট্রাফিকিং সিস্টেম চালু করে যানবাহন চলাচলে ফিরিয়ে এনেছে শৃঙ্খলা। অপরদিকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও শহরের জনবহুল গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় এনে পুরো মেট্রোপলিটন এলাকাটির সার্বিক চিত্র পুলিশের নজরদারিতে রাখা হয়েছেছে। এছাড়া মেট্রোপলিটন এলাকা গঠনের বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে মহানগরবাসী মনে করে দু'একটি ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুর মহানগরবাসীর জানমালের নিরাপত্তা প্রদানসহ সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মানবতার সেবার ক্ষেত্রেও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম, তাঁর উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনা এবং মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে রংপুর মহানগরীর মানুষকে বিভিন্নভাবে সেবা প্রদানে ভূমিকা রেখেছেন। স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে মহানগরবাসীকে ফ্রি মেডিকেল টিমের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে মানুষের মাঝে হাজার হাজার ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ এতিম শিশু, পথশিশু ও ভাসমান মানুষের সাহায্যার্থে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "মানবতার বন্ধনে রংপুর", যা ইতোমধ্যে রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উলেখ্য রংপুর অঞ্চলের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ দেশ-বিদেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাদের লেখনি ও প্রকাশনার মাধ্যমে "মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠনটির প্রতিনিয়ত চলমান কার্যক্রম'কে বেগবান ও উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছে।

কমিশনার মহোদয়ের বিশেষ নির্দেশনা মোতাবেক ২০১৯ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহ হতে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত আমি ও সহকারী পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ ফরহাদ ইমরুল কায়েস কোতয়ালী থানার সাবেক ওসি জনাব মোঃ রেজাউল করিম, রংপুর মেট্রোপলিটন কমিউনিটি পুলিশিং এর সেক্রেটারী জনাব সুশান্ত ভৌমিক, কোতয়ালী থানা কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্য সচিব আব্দুল কাদের দিদার, বাংলাদেশ রেস্তোঁরা মালিক সমিতি রংপুর এর সভাপতি জনাব আব্দুল মজিদ খোকন, সেক্রেটারী জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, সদস্য জনাব শাহ মোঃ শাহিদ আক্তার সোহেল, জনাব সাব্বির হোসেন রাজু, হেলাল হোসেন স্বপনসহ রেস্তোঁরা মালিক সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে নিয়ে দফায় দফায় আমার কার্যালয়সহ রেস্তোঁরা মালিক সমিতির বিভিন্ন রেস্তোঁরায় কয়েক বার বসে রংপুর মহানগরীর পিছিয়ে পড়া

ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষসহ এতিম শিশুদের খাবার সরবরাহ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে থাকি। এরই মধ্যে আলোচ্য বিষয়ে রেস্তোঁরা মালিক সমিতির সদস্যদের মাঝে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহনের মনোভাব পরিলক্ষিত হলে ২৫শে এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আরপিএমপি রংপুর কোতয়ালী জোন কার্যালয়ে আমার সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়কে প্রধান উপদেষ্টা করে প্রাথমিকভাবে ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠনের মাধ্যমে "মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। এটি একটি অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম মহোদয়ের আন্তরিক উদ্যোগ, প্রচেষ্টা এবং নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত সভায় রংপুর মহানগরীর ভাসমান হতদরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের মাঝে রংপুর মহানগর রেস্তোঁরাগুলি হতে রান্না করা খাবার (ভাত/ভুনা খিচুড়ি প্রভৃতি) বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতপর ৮ই মে ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে (২য় রমজান) রংপুর জেলা পরিষদ কমিউনিটি সেন্টারে পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের সভাপতিত্বে জনাব টিপু মুনশি এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উক্ত "মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠনের আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, সিও র‍্যাব, ডিসি রংপুর, মেয়র রংপুর মহানগর, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, রেস্তোঁরা মালিক সমিতির সদস্যবৃন্দসহ রংপুর শহরের সুধীজন উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

মানব সেবার নিদর্শন স্বরূপ "মানবতার বন্ধনে রংপুর" নামক সংগঠনটি উদ্বোধন শেষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গসহ এতিম শিশুদের ইফতার ও দোয়া মাহফিল এর মাধ্যমে সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। সে হতেই প্রতিনিয়ত "মানবতার বন্ধনে রংপুর" এর ব্যানারে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে (এতিমশিশু, পথশিশু, ভাসমান মানুষ) রংপুর রেস্তোঁরা সমিতির বিভিন্ন হোটেল হতে সরবরাহকৃত রান্না করা খাবার বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে সময়ের চাহিদা মোতাবেক "মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠনের সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম মহোদয়'কে সংগঠনের প্রতিষ্ঠতা ও প্রধান উপদেষ্টা এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার কোতয়ালী জোন জনাব মোঃ জমির উদ্দিন'কে সংগঠনের সভাপতি ও রেস্তোঁরা মালিক সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল মজিদ খোকন'কে সেক্রেটারী করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন পূর্বক তা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর রংপুরে আবেদন করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, যার নিবিড় পরিচর্যা ও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা এবং সার্বিক সহযোগীতা ও উৎসাহে "মানবতার বন্ধনে রংপুর" শীর্ষক সংগঠনটির আবির্ভাব ঘটে তিনি অন্য কেউ নন, তিনি হচ্ছেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুর এর কর্ণধার এবং প্রথম পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম। যার হৃদয়ে বিদ্যমান সততা, স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ, মানবিক গুণাবলি, সদাচরণ ও সহমর্মিতাসহ ধর্মীয় মূল্যবোধ এর মত বহুমাত্রিক গুনাবলীর সমাহার। পুলিশ কমিশনার মহোদয় "মানবতার বন্ধনে রংপুর" শীর্ষক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠণে আমাকে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ায় স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ স্যারকে আন্তরিক-ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। "মানবতার বন্ধনে রংপুর" শীর্ষক সংগঠনটি সৃষ্টিলগ্ন থেকে মেট্রোপলিটন পুলিশের সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ রেস্তোঁরা মালিক সমিতি, রংপুর জেলা শাখার সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ "মানবতার বন্ধনে রংপুর" স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক ও মানসিকভাবে এবং পরামর্শ দিয়ে সংগঠনের সদস্যবৃন্দকে উৎসাহিত করায় সংশিষ্ট সকলের প্রতি কৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি মনে করি মানব সেবার ক্ষেত্রে "মানবতার বন্ধনে রংপুর" নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা আরপিএমপি-এর জন্য ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে রেস্তোঁরা মালিক সমিতির উদারতা ও সহযোগিতার মনোভাব "মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠন এগিয়ে নিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। "মানবতার বন্ধনে রংপুর" এর খাবার বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকলে এ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। যারা খাবার সরবরাহের হাত প্রসারিত করেছে তারা সাধারণ জনগণ তথা সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের নিকট শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। মানবতার সেবার লক্ষ্যে "মানবতার বন্ধনে রংপুর" এর অভিষেক অনুষ্ঠানসহ পরবর্তী প্রতিটি দিবসে অসহায় দরিদ্র, ভাসমান, এতিম শিশুসহ সমাজে সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী/রান্না করা খাবার সরবরাহ করে যারা ধারাবাহিক-ভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন তাদের মধ্যে উলেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান রাজু হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, ফাল্গুনি হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, কুটুমবাড়ি রেস্তোঁরা, দেশ রেস্তোঁরা, ঢাকা বিরিয়ানী, ঢাকা বিরিয়ানী-২, রায়হান হোটেল এন্ড

রেস্তোঁরা, বাঁধন হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, শানু হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, আল আমিন হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, মিঠু হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, মিতালী হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, পলক হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, নেহাল হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, ফাহিম হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, সাফল্য হোটেল, নিউ ষ্টার হোটেল, পারভেজ হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, খালেক হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, মৌবন হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, মা মনি হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা ও চাইনিজ, মুহুয়া বিরিয়ানী, মা মনি হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, বৈশাখী হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, কস্তুরী রেস্তোঁরা, ষ্টার হোটেল, কারা ক্যান্টিন, সুপার ষ্টার হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, বৈশাখী হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, ঢাকা ফাস্ট ফুড, কফি হাউজ, কফি শপ, প্রিন্স হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, সুপ্রিমা রেস্তোঁরা, রংধনু হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা ও ফাস্ট ফুড, রাধুনী হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, শাহিন হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, মেজবান রেস্তোঁরা, আকবর হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, নিউ লাকী হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, ভাই ভাই হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, বিস্‌মিলাহ্ হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, নিরঞ্জন মিষ্টি মুখ, শাহী হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা, চাঁদনী হোটেল এন্ড রেস্তোঁরা ও দেলোয়ার হোটেল এন্ড রেস্তোঁরাসহ অনেকে। যে সকল রেস্তোঁরা মালিক সমিতির সদস্যবৃন্দ স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাদের হোটেল হতে রান্না করা খাবার সরবরাহ করে আসছেন এবং যারা প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে খাদ্য বিতরণে সহায়তা করছেন তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

"মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

'মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে' এই শ্লোগানকে ধারণ করে এবং মানবসেবার মহান ব্রত নিয়ে রংপুর মহানগরীর সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ ভাসমান ব্যক্তি এবং এতিম শিশুদের ক্ষুধা নিবারণের লক্ষ্যে সংগঠনের সদস্যবৃন্দ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো হচ্ছে:

* সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান
* উচ্চবিত্ত ও সম্পদশালী জনগোষ্ঠীকে দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিতকরণ
* মানুষের প্রতি মানুষের সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে মানব কল্যাণে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করণ
* সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গকে এ মহতী কর্মে সম্পৃক্তকরণ ও
* সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে "মানবতার বন্ধনে রংপুর" এর সাংগঠনিক কাঠামোতে এনে সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

"মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠনটির অর্জন ঃ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের স্বার্থে রংপুর মহানগরবাসীর দোরগোড়ায় আইনি সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। একই সাথে মানবসেবার ক্ষেত্রে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে পুলিশ কমিশনার রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠনের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানবসেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গঠনের এক বছরের মধ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর এতো সব জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড নিশ্চয় এ অঞ্চলের মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে, যা মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি বড় অর্জন বলে আমি বিশ্বাস করি।

সহকারী পুলিশ কমিশনার
কোতয়ালী জোন
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

‘মানবতার বন্ধনে রংপুর’ এর কিছু কার্যক্রম.....

মেলায় অংশগ্রহণ.....

আরপিএমপি'র স্টল 'জ্ঞান বিতান'

রংপুর বইমেলা ২০১৯-এ আরপিএমপি'র স্টল

বৃক্ষমেলা ২০১৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ কমিশনার মহোদয়

উন্নয়ন মেলায় আরপিএমপি'র স্টল

Bureaucratic Accountability in Bangladesh; The Role of Parliamentary Committees

Md. Sharif Al Razeeb •

Bureaucracy that includes Civil Servants who work and who have direct contact with general public. It is a particular Government unit for accomplishing specific set of goals and objectives as authorized by a legislative body / Parliament. Bureaucracy is administrative policy-making group where Secretaries are the administrative heads of the Secretariat and political heads are the Ministers. Bureaucracy also denotes a Government Administration managed by departments staffed with non-elected officials. Examples: Police, BGB, Social Workers, Tax Collectors, Government Accountants, Fire Fighters, Military Personnel etc.

Parliament is one of the most effective institutions to make the bureaucrats accountable to the elected representative, which is mandated to make legislations as well as oversee or control the activities of administrators. Public Accounts Committee (PAC) is a standing committee in the parliament. The reports of the C&AG (Comptroller and Auditor General) are discussed by the PAC. C&AG for maintaining accounts of the Republic and auditing all receipts and expenditure of the Government of Bangladesh including those of bodies and authorities substantially financed by the Government. Committee on Public Undertakings assesses the performance of public undertakings and suggests for their functional improvements. It also examines the reports of the C&AG on public undertakings. Government owned companies of Bangladesh such as BCIC, BFDC, HBFC, BIWTC, BJMC, Bangladesh Ordnance Factories etc. include different Public Undertakings. Committee on Estimates examines the estimates concerning public expenditure made by the Government on collective needs and wants such as pension, provision, infrastructure etc. Standing Committees on Ministries of the Government examine any bill or other matter referred to it by the parliament, review the works relating to a ministry, inquire into any activity or irregularity and serious complaint in respect of the ministry.

In Bangladesh due to the elitist behavior and attitudes, the civil servants become alienated from the common people. Besides, because of some other features of bureaucratic culture in Bangladesh include “tadbir-based administration”, “regionalism or districtism”, “lack of integrity”, etc. are the main hindrances on the way to a much desired bureaucratic institutionalization in Bangladesh.

There are fifty (50) Parliamentary Committees in the 11thParliament of Bangladesh. But it is a matter of great regret that these committees are yet to come into view as efficient instruments of the legislature especially in overseeing the activities of the executive, making the Government behave, ensuring accountability of the bureaucrats. The reasons are- irregularity in holding parliamentary committee meetings, improper application of the Rules of Procedures of the Parliament, partisan approach of the committee members, tendency of the executive agencies to defy the recommendations and committee directives.

Bureaucratic accountability depends on the ability of the Government especially the Prime Minister, the National Assembly, the Courts to hold bureaucrats responsible for its performance and its actions. Bureaucratic accountability will be ensured if the following measures are taken with due sincerity-

(1) The ongoing culture of personalized and party interests that is profoundly influencing both bureaucracy and parliament simultaneously must be checked.

(2) The system must be changed where the ruling politicians put control over the bureaucrats by regulating their recruitment, transfer, promotion, etc.

(3) Poly-faceted factionalism must be uprooted from the bureaucratic system.

(4) Removal of lack of mutual coordination, respect among the different cadre-officials is the MUST.

(5) Setting up of the office of Ombudsman and conducting the Constitutionalized activities of that office.

(6) Strengthening the functions of the Administrative Tribunal.

(7) The Parliamentary Committees must be regular to hold meetings as required and rational in formulation of the economic, financial, administrative, audit-accounts related policies and recommendations so that these may be properly acted on by the concerned bureaucratic officials.

Senior Assistant Commissioner of Police (CTSB)
Rangpur Metropolitan Police

“মৃত্যুকালীন জবানবন্দি যখন মিথ্যা ও হত্যা মামলার বাদী যখন সাজাপ্রাপ্ত”

মোঃ আলতাফ হোসেন •

পুলিশী জীবনের অপরাহ্ন বেলায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কত কথা, কত ঘটনা-রটনাই তো মনে পড়ে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হত্যা (!) মামলার তদন্ত কাজের স্মৃতিচারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আলোচ্য মামলাটি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী অনেক ঘটনা ও প্রথাগত সত্যাসত্যের বৈপরীত্বে ভরপুর। বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ ভবিষ্যত তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জন্য এ অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মস্মৃতি কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

১৯৯৫ সাল। জুন মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ডিআইও (সদর) থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানায় এসআই হিসেবে আমার পদায়ন হয়। সে সময় ছিল বর্ষাকাল। চাকুরী জীবনে ঐ বারেই প্রথম ও শেষ বারের মতো আমি আমার তিনজন ব্যাচমেট, মামা শ্বশুর জাহেদুর রহমান, মামা আব্দুল হাই সরকার একসাথে চাকুরী করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ফলে সদর থানার ব্যস্ততা বা অন্য যে কোন পীড়াদায়ক কাজ আনন্দের সাথে ভাগাভাগী করে সব কিছুতেই ফূর্তি খুঁজে পেতাম। জানিনা এখনকার ব্যাচম্যাটরা এমন আনন্দ পান কিনা! সদর থানার চাকুরীর প্রথম কর্মদিবসে আমাকে রাত্রিকালীন গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের অফিসার হিসেবে নিয়োজিত করা হলে আমার ব্যাচম্যাট মামা আব্দুল হাই সরকার আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য আমার সাথে যেতে আগ্রহী হন। সিঙ্গেল কেবিন পিকআপে গাদাগাদি করে গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিলের জন্য গোবিন্দপুর এলাকায় যাই। জুতা খুলে, প্যান্ট তুলে কোথাও হাটু পানি, কোথাও আরোও বেশি পানি ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পাড়ি দিয়ে একাধিক পরোয়ানা ভুক্ত আসামী হুমায়ুন এর বাড়িতে পৌছি এবং ‘রেইড’ দেই। স্থানীয় গ্রাম পুলিশের নিশ্চিত সংবাদের পরও আসামীকে বাড়ির কোথাও না পেয়ে বিফল মনোরথে ফেরার মুহূর্তে টর্চলাইট জ্বালিয়ে চালের উপর “চালকুমড়ার পুরের” মাঝে বস্তায় ঢাকা বড় একটা চালকুমড়াকে নড়তে দেখে সন্দেহ হলে “নেমে আসো” পুলিশের হুংকারে আসামী হুমায়ুনকে পাকড়াও করতে সমর্থ হই। এটা আমার ঐ থানায় প্রথম গ্রেফতার আর চতুর হুমায়ুনের জীবনে প্রথম পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারের ঘটনা। প্রথম দিনের এ অপারেশনে আরো কয়েকটি সাফল্যে আমার ব্যাচম্যাট এসআই হাই সরকার সহ সঙ্গীয়দের মন্তব্য ছিলো “সদর থানায় আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন”। কিন্তু এই “হুমায়ুন” যে আমাকে পরবর্তীতে ভাগ্যহীনদের কিনারে ফেলে দেবার উপক্রম করবে; পরিশেষে ভাগ্যবানদের কাতারে সামিল করবে তা অন্তত তখন আমার জানা ছিলো না।

২১ আগষ্ট ১৯৯৫ সালে আমি থানায় ডিউটি অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে সিরাজগঞ্জ এলাকার করিৎকর্মা এএসআই মোঃ খলিলুর রহমান রাত্রিকালীন ডিউটি শেষে গোবিন্দপুর ও রামচন্দ্রপুর এলাকা হতে থানার সিসি (কমান্ড সার্টিফিকেট) জমা দিয়ে স্বভাবসুলভভাবে বলা শুরু করলেন যে, ফেরার পথে হুমায়ুন কে তাদের বাড়ীর নিকট গোরস্থানের পার্শ্বে ব্যান্ডেজ বাধা রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে এলেন। এলাকার লোকজন তার এ দশা দেখে কান্নাকাটি করছে। হুমায়ুনের কষ্টে স্থানীয় লোক কাঁদবেন এটা একটা “বাহুল্য কথা” বলে ১৯৭৩ ব্যাচের বেষ্ট ক্যাডেট ওসি জনাব কে, এম মোঃ হাবিবুর রহমান সাহেব এএসআই খলিলুরকে “জোলা” বলে ভৎসনা করে তার অফিস কক্ষে ঢুকলেন। একজন অফিসার ইনচার্জ, এলাকার লোকজন বিশেষত খারাপ লোকজনের ব্যাপারে কতটা ওয়াকিবহাল থাকেন তা পরবর্তীতে ঘটনা প্রবাহে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন।

ঐ দিনই পড়ন্ত বিকেলে আমার ডিউটি অফিসার হিসেবে দায়িত্ব চলমান অবস্থায় সদর হাসপাতালের আরএমও সাহেব একটি অভিনব চিঠি পাঠালেন যাতে লেখা ছিল যে, হুমায়ুন নামের একজন রোগী আহত অবস্থায় তার হাসপাতালে ভর্তি

আছেন। যার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ও মুখে বিষের গন্ধ বিদ্যমান। ঐ রোগী পুলিশের কাছে কিছু বলতে চায়। পত্রটি পেয়ে আমি তাৎক্ষনিকভাবে সাধারণ ডায়রীতে নোট করে আমার ব্যাচমেট মামা এসআই মোঃ আব্দুল হাই সরকারকে পত্রটি ধরিয়ে দিয়ে রোগীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করি। উর্বর মস্তিষ্কের আমার মামা এসআই মোঃ হাই সরকার ঐ সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুলিশের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে রিপোর্ট করা "দৈনিক নবাব" পত্রিকার সাংবাদিক পুলিশের ছেলে সৈয়দ নাজাদ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হুমায়ুন এর জবানবন্দী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেন। যাতে কর্তব্যরত নার্স ও সাংবাদিক সৈয়দ নাজাদ হোসেন এর সঙ্গী হিসেবে স্বাক্ষরও গ্রহণ করেন। উক্ত জবানবন্দির সারমর্ম ছিলো এমন যে, হুমায়ুন গরু- মহিষের ব্যবসা করেন। বাগভোব হাটে গরু বিক্রি করে টাকা নিয়ে বাগভোব ঘাট পাড়ি দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে তার প্রতিবেশী তায়েজ উদ্দিন মাষ্টারসহ মাষ্টারের অন্যান্য ভাই ভাতিজারা তাকে পূর্ব শত্রুতার কারণে আটক করে। আটকের পর মারপিট করে এবং পানি খেতে চাইলে স্টিলের গ্লাসে তরল কিছু খেতে দেয়। তিনি তা পান করা মাত্রই বুক জ্বলা ভাব হয় এবং বমি করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তাকে তার জখমগুলো কে ব্যান্ডেজ ও সেলাই করেছে সে ব্যাপারে জানতে চাইলে সে সময় অজ্ঞান ছিল বলে সে বিষয়ে জানাতে ব্যর্থ হয়। তাকে আসামীরা চর এলাকা থেকে তার বাড়ীর পার্শ্বের গোরস্থানে কেন নিয়ে যায় এমন প্রশ্নে তিনি প্রচন্ড ব্যথায় কাতর বিধায় কথা না বাড়িয়ে ঘুমিয়ে যান। উপরের এই জবানবন্দি নিয়ে থানায় ফিরে এসআই আব্দুল হাই সরকার আমার নিকট দিলে আমি বিষয়টি অফিসার ইনচার্জকে অবগত করি এবং তার নির্দেশনা মোতাবেক হুবহু জিডি ভুক্ত করি।

তখনকার দিনে আমাদের ২৪ ঘন্টার জন্য ডিউটি অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হতো, যার মেয়াদ দিন সকাল ০৮.০০ ঘটিকা হতে পরদিন সকাল ০৮.০০ ঘটিকা। বিগত দিনমানের ঝামেলা মিটিয়ে পরদিন ১০.০০/১১.০০ ঘটিকার আগে স্ত্রী সন্তানদের মুখ দেখার সুযোগ হতো না। এখন ডিউটি অফিসারদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রেস্ট এর জন্য শোবার ব্যবস্থা থাকলেও তখনকার দিনে পুরাতন ভবন গুলোতে রাত্রিকালীন বিশ্রাম নিতে হতো অফিসের একাধিক টেবিল একত্র করে পালংক বানানোর মাধ্যমে। ঐ দিন দিবারাত্রি ০১.৩০ টার পর আমি এমনি একটা পালংকে রাত্রিকালীন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। ভোরের আলো প্রস্ফুটিত হওয়ার আগে এমনকি ফজরের আযানের আগে সেন্ট্রি কনস্টেবলের স্যার স্যার ডাকে অর্ধনিদ্রা ভংগ করে জানতে চাইলাম ডাকার হেতু কি? তিনি জানান একজন লোক কথা বলবেন। বিরক্তি সহকারে আরামের পালংক থেকে উঠে বসে লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি আর কেউ নন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বারের আলোচিত এ্যাড: আলতাফ সাহেবের (তাকে লোকজন এসি বলে ডাকতেন) মুহুরী। ঘটনা কি জিজ্ঞাসায় উত্তর এলো " স্যার, হুমায়ুন হাসপাতালে মারা গেছে "। মৃত্যু মানুষের চিত্তকে দূর্বল করে। হোক না সে যতই নগণ্য বা খারাপ লোক। সমবেদনা জানিয়ে বললাম তার আত্নীয় স্বজনকে নিয়ে আসেন মামলা হবে, বিচারের ব্যবস্থা হবে। হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ আমাকে আর পালঙ্কে যুক্ত হতে দিল না । আমি উঠে হাত মুখ ধুয়ে জিডি লেখা সহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করতে থাকলাম।

সকাল অনুমান ০৬.০০ ঘটিকা। মৃত হুমায়ুনের আপন ছোট ভাই (যিনি এলাকায় থাকেন না, আমনুরা এলাকায় বিবাহ করে পরবাসি হয়েছেন) এ্যাডভোকেট এসি সাহেবের সেই মুহুরী এবং এসি সাহেবের শিক্ষিত অর্থনীতি পড়ুয়া জামাতা (আমার ভার্সিটির ও একই বিষয় অর্থনীতির ছাত্র) ৪৩ জন আসামীর সুনির্দিষ্ট নাম ঠিকানাসহ আরোও ৮/১০ জন অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে টাইপ করা একখানা এজাহার নিয়ে আমার সামনে দন্ডায়মান। তাদের দাবী লাশ সৎকারে যাবেন, তাদের অনেক কাজ, তাড়াতাড়ি মামলাটি রেকর্ড করে মামলা নম্বরটি দিতে হবে। আমি তাদেরকে গতকাল বিকেলে হুমায়ুন কর্তৃক জবানবন্দীতে ৬/৭ জনের নামের বাহিরে এতগুলো নাম কেমন করে জানলেন প্রশ্ন করলে তারা এ্যাড: এসি সাহেবের শেখানো বুলি আউরিয়ে বললেন যে, পুলিশ চলে আসার পর জ্ঞান ফিরলে এ নামগুলো বলেছেন। হুমায়ুন কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দীটি তার মৃত্যুর কারণে মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে রূপান্তরীত হওয়ায় এবং সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারা মতে এর সাক্ষ্য মূল্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত বক্তব্য সন্দেহ জনক হলেও মৃত্যু পরবর্তী এতোগুলো ব্যক্তির নাম না ঢোকানোর অনুরোধ-উপরোধ-উপদেশ দিতে থাকলাম। কিন্তু না, তারা কোন মতেই তাদের টাইপকৃত এজাহারের বাহিরে যেতে রাজি নন। সে যুগে টাইপ মেশিন সাধারণত কারও বাড়িতে থাকত না। আদালত প্রাঙ্গন ও অফিসে ছাড়া টাইপ মেশিন বা টাইপিষ্ট এত সহজলভ্য ছিল না। অথচ হুমায়ুন ভোর ০৫.০০ টার দিকে মৃত্যুবরণ করার পর মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে ৪৩ জন আসামীর নাম ঠিকানা ব্যক্ত করে টাইপকৃত এজাহারটি

যে পূর্ব পরিকল্পিত, বানোয়াট ও সত্যের অপলাপ তা স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলাম। এসব কিছু বুঝার পরও পুলিশের চাকুরির সীমাবদ্ধতার জন্য হুমায়ুনের মৃত্যুর বিচার চাইতে আসা তার ভাই (শিক্ষক) আত্মীয়দেরকে বিভিন্নভাবে সত্য ঘটনা অবলম্বনে মামলা করার বা অন্তত মৃত্যুকালে হুমায়ুন কর্তৃক বলা নামগুলোকে এজাহার ভুক্ত করার কোন উপদেশ কাজে আসছিল না। এমন বাক বিতর্কে প্রায় সকাল ০৮.০০ টা অতিক্রান্ত হলো। আমার ডিউটি অফিসারের মেয়াদ শেষ। কিন্তু উদ্ভূত সমস্যার সমাধান না করে দায়িত্ব অর্পণ করা সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়। অবশেষে এ্যাড: আলতাফ @ এসি সাহেব আদালতের পোশাকে ও ব্যাগ হাতে থানায় এলেন এবং বিগত ঘটনা প্রবাহ তেমন না জানার ভান করে আমাকে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৫৪ ধারার বিধান মতে এজাহার দিলে মামলা নেয়ার বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হুমকি দিতে থাকলেন। আমি আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং ন্যায়বোধ থেকে এতবড় নির্জ্জলা মিথ্যা মামলায় ৪৩ জন ব্যক্তিকে হত্যা মামলায় জড়িত করে মামলা নেয়ার আপত্তি না জানিয়ে আইনের বিকল্প ভাষায় উকিল সাহেবের থেকে মৃত হুমায়ুনের ভাইকে (শিক্ষক) আলাদা করে ডাকলাম। তাকে জানালাম মৌখিকভাবে এজাহার দিলে তবেই আমি নিবো, (অভিজ্ঞতা বলে যে, একজনের পক্ষে ৪৩ জনের নাম ঠিকানা বানিয়ে বলা সম্ভব নয়)। লিখিত এজাহার গ্রহনে আমি বাধ্য নই; পছন্দ না হলে কোর্টে মামলা করেন ইত্যাদি ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করে অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ করা হলো এই মর্মে যে, হুমায়ুনের মৃত্যুকালে প্রদত্ত জবানবন্দীকে ভিত্তি করে আরও ৬/৭ জন ব্যাক্তির নাম সংযুক্ত করে তারা লিখিত এজাহারই প্রদান করবেন। অবশেষে বহু জল ঘোলা করে কাঁদামাটি মাখামাখি শেষে হত্যা মামলাটি রুজু হলো। চৌকস ও স্বনামধন্য অফিসার ইনচার্জ আমার মামলা গ্রহণের তুলনামূলক ন্যায়ানুবর্তিতা প্রত্যক্ষ করে মামলাটির তদন্তভার আমার উপর অর্পন করার আগ্রহ দেখালে আমি বিনীতভাবে বাদী পক্ষের সাথে আমার মনোমালিন্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করলাম। পরবর্তীতে মামলাটি আমাদের পূর্বের ব্যাচের অর্থাৎ ১৯৮৭ ব্যাচের ক্যাডেট বর্তমান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এনামুল হক চৌধুরীর (যিনি তখন SAT মিশনের জন্য নির্বাচিত ছিলেন) উপর অর্পন করাতে সমর্থ হলাম। এসব কার্যকলাপে তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। চৌধুরী স্যার বেজায় বেজার মনে মামলার তদন্তভার নিয়ে আমাকে বললেন যে, চলেন সুরতহালটা একসঙ্গে করে আসি। ফলে সকাল ০৮.০০ টার ডিউটি অফিসারের দায়িত্ব হস্তান্তর হলেও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া আর হলো না!!

২২ আগষ্ট ১৯৯৫ বেলা অনুমান ১৩.০০ ঘটিকার দিকে মৃত হুমায়ুনের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন এসআই এনামুল হক চৌধুরী। সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত কালে দেখা যায় মৃতের মাথার ডান পার্শ্বে পিছনের দিকে একটা জখম যা পারদর্শী চিকিৎসক দিয়ে যথাযথভাবে সেলাই দেয়া, সেলাই এর আগে মাথার চুলগুলো ছিলানো হয়েছিল, কিন্তু চুলগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণে অনুমিত হয় যে, এ কর্মযজ্ঞটি অন্তত ৪/৫ দিন আগে সম্পন্ন করা হয়েছে। শরীরের অন্যান্য জখমের কিনারাতে ঘা শুকানোর লক্ষন বিদ্যমান। ফলে হুমায়ুনের মৃত্যুকালে ২০ আগস্ট অর্থাৎ মাত্র ২ দিন আগের জখম বা সেলাই কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বিকল্প কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আইনের ভাষায় হুমায়ুনের প্রদত্ত বক্তব্যই মৃত্যুকালীন জবানবন্দী যা, অলংঘনীয় বাণী হিসেবে বিবেচ্য। আমার দেখা তদন্তকারী অফিসারগণের মধ্যে এনামুল হক চৌধুরী সাহেবের তদন্তের ক্ষেত্রে প্রত্যুৎপন্নমতিতা ঈর্ষণীয়। তিনি মামলার তদন্তকালে অনেক প্রশ্নের অবতারণা করে (প্রথম কেস ডায়েরি) সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন এবং হুমায়ুনের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী যে সত্য নয় তা প্রমানের জন্য পার্শ্ববর্তী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। কিন্তু ইতোমধ্যে জাতিসংঘ মিশনে গমনের নির্দেশনা পেয়ে তিনি মামলার ডকেট (নথিপত্র) অফিসার ইনচার্জের কাছে হস্তান্তর করে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। "আমাকেই ধুতে হবে" হুইল পাউডারের বিজ্ঞাপনের মতো মামলার তদন্তভার পুনরায় আমার চওড়া কাধেই অর্পিত হলো। আমি মামলার ঘটনার আদ্যপ্রান্ত অবগত হলেও মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর সাক্ষ্য মূল্যের অকাট্যতা ও মৌলিকতার কাছে পরাজিত হয়ে অবশেষে বাধ্য হয়ে জীবনের সবচেয়ে অপ্রিয় কাজ মিথ্যা মামলায় অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। আসামীদের ছয় জনই ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আসামী তায়েজ মাষ্টারসহ আরো কয়েক জনের অবসর যাওয়ার সময়ও প্রায় সমাগত। স্থানীয় মহসীন চেয়ারম্যান পুলিশ বান্ধব এবং এ মামলায় সত্য প্রমাণে অবিচল থাকলেও বাস্তবতার নিরিখে তিনিও হুমায়ুনের জবানবন্দীর কাছে আমার মতো হার মেনে হাপিত্যেশ করতে থাকেন।

শুধু কি তাই ? আইন জানা লোক যদি আইনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চান তাহলে তা যে কত কঠিন কঠোর হতে পারে তা মামলার জন্মলগ্ন থেকে তদন্ত করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। একদিকে মামলার প্রকৃত রহস্য উৎঘাটন

করতে না পেরে জ্ঞাতসারে একটি মিথ্যা মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করে ৬ জন নিরীহ শিক্ষকসহ নিরপরাধ ১৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার অভিযোগ পত্র দাখিলের অব্যক্ত যন্ত্রনা; অন্যদিকে মামলার নেপথ্য খলনায়ক এ্যাড: এসি সাহেবের ইন্ধনে ও প্রত্যক্ষ মদদে তদন্তকারী অফিসার তথা "আমার" বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ সর্বস্থানে দরখাস্ত দিয়ে সত্য-মিথ্যা একাকার করে তদন্তকারী অফিসারকে তটস্থ রাখে। এসময় মামলার সত্য উৎঘাটনসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার অনুসন্ধান-কে হজম করতে ব্যাপৃত থাকাই হয়ে উঠে আমার ধ্যান-জ্ঞান। ভাগ্যিস সুহৃদ সুযোগ্য ও ন্যায়পরায়ন পুলিশ সুপার জনাব জাহাংগীর হোসেন স্যার আমার কৃতকর্মের প্রতি বরাবরই আস্থাশীল ছিলেন।

ঘটনার প্রায় ৩/৪ মাস পরে দুপুরে অবসাদগ্রস্ততায় অবসন্ন হয়ে থানা ক্যাম্পাসের সরকারি বাসায় দিবা নিদ্রায় থাকাকালে রামচন্দ্রপুর হাটের (গরুর বিখ্যাত হাট) ইজারদারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে জানিয়ে মহাসীন চেয়ারম্যান চৌকিদার পাঠিয়েছেন। চৌকিদারের কড়া নাড়ায় আকস্মিক হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠলো। ঘটনা জেনে তাৎক্ষনিক মটর সাইকেলযোগে রামচন্দ্রপুর হাটে যাই এবং ইজারদারের কাছে একজন গরু ব্যবসায়ী যার আদি নিবাস রামচন্দ্রপুর হলেও বর্তমানে বগুড়ায় থাকেন, (নাম মনে নেই) তার কাছে দৈনিক করতোয়া একটি পত্রিকা মোড়ানো ও পেঁচানো অবস্থায় দেখি। উল্লেখ্য দৈনিক করতোয়া তখনও জাতীয় পত্রিকায় রুপান্তরিত হয়নি। উক্ত পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ দাতার বরাত দিয়ে গত ১৯/০৮/১৯৯৫ তারিখের একটা সংবাদ ছাপানো হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দক্ষিণ গোবিন্দপুর নিবাসী জনৈক হুমায়ুন কবিরকে মহাস্থান হাটে দুধের সাথে বিষ খাইয়ে দুর্বৃত্তরা তার মহিষ বিক্রির কুড়ি হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তিনি বগুড়া সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই হত্যা মামলার যেমন ক্লু আমি ও আমার পূর্ববর্তী তদন্তকারী অফিসার খুঁজছিলাম, তেমন একটা ক্লু পেয়ে তৎকালীন পুলিশ সুপার জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন স্যারকে ঘটনা জানিয়ে বগুড়া হাসপাতালের উদ্দেশ্যে ভোঁ দৌড় দিলাম। হাসাপাতালের রেজিষ্টার পত্রে দেখা যায় যে, ১৮ আগষ্ট ১৯৯৫ তারিখ সকাল অনুমান ০৭.৩০ ঘটিকার দিকে মাথায় ও হাতে-পায়ে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয় কিন্তু ১৯ আগষ্ট ১৯৯৫ তারিখ বিকালে রোগী হুমায়ুন কবির হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কিছু না বলেই পালাতক হোন। রেজিষ্টার পত্রে আরো দেখা যায় যে, গোকুল, মহাস্থানগড়ের জনৈক মঞ্জু তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এতটুকু তথ্য পেয়ে "ইউরেকা ইউরেকা" বলে লাফাতে লাফাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ গিয়ে হাসপাতালের রেজিষ্টারের সত্যায়িত ফটোকপি ইত্যাদি দেখিয়ে বাহবা নেয়ার চেষ্টা করলে সুহৃদ পুলিশ সুপার স্যারের স্বভাবসুলভ গালী "... ভাই" শুনে সম্মিত ফিরে এলো। বুঝলাম এমন মামলার তদন্ত অত সহজ কর্ম নয়। তিনি আমাকে সামনে বসিয়ে পরম মমতায় মামলাটির করণীয় বর্জনীয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করলেন এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মৃত হুমায়ুনের দূর্ঘটনার সময় অবস্থান জানা, দূর্ঘটনার বা ছিনতাই এর ব্যাপারে থানায় জিডি বা মামলার হদিস নেয়া, জনৈক মঞ্জু ও নিজস্ব সংবাদদাতাকে খুজে বের করে তাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা, হোটেলে অবস্থান করে থাকলে ঐ রেজিষ্টার জব্দকরন ইত্যাদি লিখিত একটি নির্দেশনামা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন এবং তার বাড়ী বগুড়ায় হওয়ায় তার চাচাতো ভাইকে চিঠি লিখে আমাকে তদন্ত কাজে সহায়তার জন্য লিখে পাঠালেন। যাহোক, নিজের মেধা, পেশাগত যোগ্যতা, পুলিশ সুপার স্যারের দিক নির্দেশনা মোতাবেক মামলাটির তদন্ত সম্পন্ন হলো।

যার সারমর্ম ছিল-

হুমায়ুন পেশাগতভাবে গরুর দালাল ও ব্যবসায়ী। বিভিন্ন জনের পুঁজিতে তিনি ব্যবসা করতেন। প্রতিবেশী তায়েজ মাস্টারের সাথে তার ও তার ভাইদের বিবাদ চলছিল। গত ১৭ আগষ্ট/৯৫ তারিখ তিনি মহিষ বিক্রির জন্য মহাস্থানগড় হাটে আসেন। ২৫ হাজার টাকার মহিষ বিক্রি করে মহাস্থানগড়ের হোটেলে রাত্রিযাপন করেন। ১৮ আগষ্ট/৯৫ সকালে ঘুম থেকে উঠে হোটেলের পূর্ব পার্শ্বের মহাসড়কের অপর পারে খাবার হোটেলে যাওয়ার সময় রংপুরের দিক থেকে বগুড়াগামী একটি বাসের ধাক্কায় আহত হলে টেম্পু চালক মঞ্জু তাকে বগুড়া হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি মহিষ বিক্রয়লব্ধ টাকা পুঁজি সবরাহকারীকে না দিয়ে আত্নসাতের ফন্দিতে দৈনিক করতোয়ার রিপোর্টারকে জানান যে, তাকে দুধের সাথে বিষ খাইয়ে মহিষ বিক্রির টাকা ছিনতাই করা হয়েছে। অতঃপর এতেও মতলববাজী পূর্ণ না হওয়ায় দূর্ঘটনায় প্রাপ্ত জখমগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তার চিরশত্রু তায়েজ মাষ্টারদেরকে মামলায় ফাসানোর কুমতলবে ১৯ আগষ্ট/৯৫ তারিখ বিকালে বগুড়া হাসপাতাল থেকে পালাতক হোন। ২০ শে আগষ্ট/৯৫ সকালে পরিকল্পিতভাবে তার বাড়ীর নিকটস্থ কবরস্থানের পাশে আহত অবস্থায় কাতরাতে থাকেন।

পরিকল্পনা মোতাবেক তার আত্মীয় স্বজন তাকে নবাবগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করান এবং এ্যাড: সাহেবের কুপরামর্শে হাসপতালের আরএমও কে দিয়ে থানায় চিঠি পাঠান এবং পরবর্তীতে হুমায়ুনের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী পুলিশকে দিয়ে লিপিবদ্ধের ব্যবস্থা করেন শত্রুতা উদ্ধারের জন্য। আল্লাহর এক অপার মহিমায় অপচিকিৎসা বা বিনা চিকিৎসায় হুমায়ুনের মৃত্যু হয় এবং ঐ হত্যা মামলাটি সৃজিত হয়। শত্রুদের ক্ষতিসাধন চাইলেও হুমায়ুন অবশ্যই মরতে চাননি। কিন্তু তার কৃত কর্ম তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার জীবনলীলা সাঙ্গ করেছে।

মামলার তদন্তটি ছিল বিশাল কর্মযজ্ঞ, যার নথিতে ছিল প্রায় ২০০ পাতা। সারমর্মে বলা যায় যে, মামলাটির 'চূড়ান্ত রিপোর্ট মিথ্যা' প্রমাণ করা হয়েছিল এবং কৌশলগত কারণে নাটের গুরু এ্যাড: এসি সাহেবকে বাদ দিয়ে মামলার বাদী ও তার অপর ভাইকে (যিনি বাদীকে সকল অপকর্মে সহায়তাকারী) জড়িত করে মিথ্যা মামলা দায়ের করার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ২১১/১১৪ ধারায় নন এফ আই আর প্রসিকিউশন দাখিল করা হয়েছিল। বিজ্ঞ বিচারক বাবু মলয় কুমার রায় তাদের প্রত্যেককে ২(দুই) বছর করে জেল দিয়েছেন। আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি বহুকালের প্রচলিত এবং সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারা মতে অকাট্য বলে বিবেচিত "মৃত্যুকালীন জবানবন্দীকে" মিথ্যে প্রমাণ করতে পেরে আর নিরীহ নিরাপরাধ কতগুলো মানুষকে মিথ্যে হত্যা মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদানে ভূমিকা রাখতে পেরে !!!

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অনন্য উদ্যোগ

নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের পবিত্র জন্মভূমি রংপুরে যাতে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ কোনভাবেই বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা অনুসারে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষদের নিয়ে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন)। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসাধারণের মাঝে জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ড চালানো হয় (যেমনঃ- সকলকে একটি সুশিক্ষিত ও উন্নত সমাজ, দেশ ও জাতি বিনির্মাণে নারী ও শিশুদের গুরুত্ব বুঝানো; ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহের আলোকে প্রতিটি ধর্মীয় ব্যবস্থায় নারী ও শিশুদের সম্মান ও গুরুত্ব সর্ম্পকে বুঝানো; স্কুল ও কলেজে নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে সঠিক পাঠদান; ধর্মীয় মূল্যবে-ধ ও নৈতিক শিক্ষা; মসজিদ, মন্দির ও গির্জায় এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা; জন প্রতিনিধিদের এ সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানসহ সর্বোপরি প্রত্যেক মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের আবশ্যকভাবে নিজেদের সন্তানদের প্রতি আরও যত্নবান ও সচেতন করে তোলা হয়)। এছাড়াও উঠান বৈঠক, বিট পুলিশিং, প্রো-এ্যাকটিভ কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কাউন্টার ন্যারেটিভ প্রচার ও প্রচারণা করে দারুণ সাফল্য পাওয়া গেছে। মাহিগঞ্জ ও হারাগাছ থানা এলাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সর্ব সাধারণের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হয়।প্রোগ্রামটিতে অত্র থানাসমূহের নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত মামলার পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রাম ও কাউন্টার ন্যারেটিভ সংযুক্ত ছিল। থানাধীন ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে তদূর্ধ্ব সকল বিদ্যা-লয়, মাদ্রাসা, কলেজ, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, বিড়ি ও অন্যান্য ফ্যাক্টরীসহ সকল জনবহুল স্থানে সভা/ উঠান বৈঠক/ বিট পুলিশিং আকারে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণা করা হয়।

মাহিগঞ্জ ও হারাগাছ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধ ও তৎসংশ্লিষ্ট আইনে রুজুকৃত মামলা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্ণিত মামলা সমূহের ভিকটিমরা অধিকাংশই ১২-১৮ বছর বয়সী মেয়ে-শিশু ও স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী। উল্লিখিত মামলার ভিকটিমরা নারী ও শিশু নির্যাতনের মত ঘৃণ্য অপরাধের শিকার হওয়ায় তারা বিদ্যালয়ে যেতে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তাদের শিক্ষা গ্রহণ মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অনেক মেয়ে অকালে গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। ফলে মা ও শিশু উভয়ের জীবন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ও সংকটময় হয়ে উঠছে। আপোষ মীমাংসা ও সামাজিকতার খাতিরে অপরাধের শিকার অনেক মেয়েই বাল্য বিবাহের শিকার হচ্ছে। আবার অনেক মেয়ে শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং, ধর্ষণ, অপহরণ ও অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়ে মান সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে আত্মহত্যার শিকার হচ্ছে। কোন এলাকায় এ রকম একটি ঘটনা ঘটে থাকলে স্বভাবতই অত্র এলাকার অন্য মেয়েরা ও আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং বিদ্যালয়ে যেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। যা অত্র এলাকার শান্তিপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিরাপদ বসবাস, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার অন্তরায়।

মাহিগঞ্জ থানার একটি বিদ্যালয়ে প্রোগ্রামটির শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম, পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর মহোদয়। সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) মোঃ ফারুক আহমেদ এর সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনায় মাহিগঞ্জ ও হারাগাছ থানার অফিসার ইনচার্জ, সকল অফিসার ও ফোর্সদের আন্তরিক প্রয়াস এবং অত্র থানাসমূহের সকল শ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে প্রোগ্রামটি সফলভাবে পালিত হয়। অত্র জোনের সকল বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, বিড়ি ও অন্যান্য ফ্যাক্টরীসহ সকল জনবহুল স্থানে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মাহিগঞ্জ জোনের আওতাধীন মাহিগঞ্জ ও হারাগাছ থানার৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে তদূর্ধ্ব ২৪ টি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২০ টি মাদ্রাসা, ৪৭ টি হাট-বাজার, ১৫ টি বিড়ি ও অন্যান্য ফ্যাক্টরী, ৩ টি কলেজ, থানাধীন সকল ধর্মীয় প্রতিনিধি এবং মে দিবসে প্রচারণা করা হয়। এতে প্রায় মোট ৪২,০০০ (বিয়াল্লিশ হাজার) বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও বয়সের জনসাধারণের নিকট নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কাউন্টার ন্যারেটিভটি পৌঁছে যায়। লিফলেট আকারেও এটি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে- কাউন্টার ন্যারেটিভের সার-সংক্ষেপ

অত্র জোনের থানাধীন এলাকা সমূহে সর্ব সাধারণের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রো-এ্যাকটিভ কার্যক্রম ও কাউন্টার ন্যারেটিভ এর আলোকে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রস্তুতকৃত প্রোগ্রাম অনুযায়ী বর্ণিত স্থানে যথা সময়ে আলোচনা সভা/উঠান বৈঠক/ বিট পুলিশিং/মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। জনসচেতনতামূলক প্রোগ্রামটি সহজে এবং স্বল্প সময়ে বাস্তবায়ন ও ফলপ্রসূ করার জন্য প্রত্যেক থানায় ০৩ টি করে দল গঠন করা হয়। প্রতিটি দল০১ জন পুলিশ পরির্দশকের নেতৃত্বে০২ জন এসআই, ০২ এএসআইয়ের সমন্বয়ে গঠন করা হয়। উক্ত দলসমূহ প্রোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ, হাট-বাজার ও কল-কারখানায় নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে কাউন্টার ন্যারেটিভ এর আলোকে ছাত্র/ছাত্রী ও জনসাধারণের মাঝে প্রচারণা চালায়।বর্ণিত প্রোগ্রামে ব্যবহৃত নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও মণীষীদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) মোঃ ফারুক আহমেদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জনসচেতনতামূলক কাউন্টার ন্যারেটিভটি হুবহু তুলে ধরা হলো।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে- কাউন্টার ন্যারেটিভ

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"

ভূমিকা ঃ

মহান সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টি হয় মায়ের গর্ভে। আমরা বেড়ে উঠি মায়ের হাত ধরে। আমরা হাটা-চলা-ফেরা ও কথা বলা শিখি পরম মমতাময়ী মায়ের স্নেহের পরশে। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী জাতি- কখনো মা হয়ে আমাদের আদর-যত্নে স্নেহের পরশে মানুষ রুপে গড়ে তুলেন, কখনও বোন হয়ে সদা আমাদের সুখে-দুখে পাশে থাকেন, কখনও স্ত্রী হয়ে প্রেম-ভালোবাসায় মায়া-মমতায় আমাদের জীবন পরিপূর্ণ করে তুলেন এবং কখনও কন্যা হয়ে আমাদের ঘর আলো করে আসেন ও স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে বিপদে-আপদে ও অসুখ-বিসুখে সেবা-শুশ্রূষায় ভরিয়ে তুলেন আমাদের জীবন। এরূপে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সর্ব ক্ষেত্রে নারীরা আমাদের পরিপূরক হয়ে বিরাজমান। পুরুষ ও নারী সকল কাজে একে অপরের সহায়ক। পুরুষ ছাড়া নারী ও নারী ছাড়া পুরুষের অস্তিত্ব অকল্পনীয়।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ঃ

নারীদের 'মা' হিসেবে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার আসনে অলংকৃত করেছে ইসলাম। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'। রাসূল (সাঃ) বলেছেন "তোমাদের সন্তানদের মধ্যে মেয়েরাই উত্তম"। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে রয়েছে 'তারা তোমাদের আবরণ স্বরুপ আর তোমরা তাদের আবরণ' (সূরা-২ আল-বাকারা, আয়াত ঃ ১৮৭)। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো' (সূরা-৪ নিসা, আয়াতঃ ১৯)। নারীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে 'তোমরা তাদের (নারীদের) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও' (সূরা-৪ নিসা, আয়াত ঃ ১৯)। এছাড়াও শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন' (সূরা আলাক: ১)। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে- 'ইলম শিক্ষা করা (জ্ঞানার্জন করা) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরজ (উম্মুস সহিহাঈন-ইবনে মাজাই শরিফ/মুস্তাদরাকুল ওয়াসিল হাদিস নং ২১২৫০)'।

নারীদের মর্যাদা নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি/দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

- সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা সেনাপতি ফরাশি বিপ্লবের অগ্রনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন- 'তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দিবো'।

- প্রতিটি মেয়ের প্রতি পিতার অগাধ ভালোবাসা ও গুরুত্ব সম্পর্কে হুমায়ুন আহমেদ বলেছেন-

  'প্রতিটা মেয়ে হয়তো তার স্বামীর কাছে রাণী হয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু প্রতিটা মেয়েই তার বাবার কাছে রাজকন্যা হয়ে থাকে'। তিনি মেয়েদের আবেগপ্রবণতা নিয়ে লিখেছেন- 'তরুণী মেয়েদের হঠাৎ আসা আবেগ হঠাৎ চলে যায়। আবেগকে বাতাস না দিলেই হলো। আবেগ বায়বীয় ব্যাপার, বাতাস পেলেই তা বাড়ে। অন্য কিছুতে বাড়ে না'।

- সভ্যতার উন্নয়নে নারীর অবদান সম্পর্কে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন-
  বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর; অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের- ১৯(৩) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি কাজে মহিলাদের যুক্ত হওয়া ও প্রাপ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন'। এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি ও চাকরিসহ রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার সম্পর্কে ২৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন'।

আইনগত ভিত্তি ঃ

নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে দেশে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০(সংশোধনী/২০০৩)' বিদ্যমান আছে। এই আইনে নারী ও শিশুর প্রতি সংঘটিত অপরাধসমূহ (ধর্ষণ, অপহরণ, ধর্ষণের পর খুন, নারী ও শিশু পাচার, যৌনপীড়ন) কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে অপরাধীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডসহ মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঃ

জাতীয় জীবনে নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণসহ সাংবিধানিক বিধি-বিধান ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার ২০১১ সালে জাতীয় 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালায় বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সেসব অধিকার ও সুযোগ রয়েছে এবং জাতিসংঘের, নারীসনদে সেসব ধারা রয়েছে তার সারসংক্ষেপ রয়েছে।

শিশুদের নিরাপদ বিকাশের গুরুত্ব ঃ

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুই আগামীতে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও ভাগ্য পরিবর্তনের মহান দায়িত্বে নিয়োজিত হবে। তাই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত, মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যাবসায়ী, পরমতসহিষ্ণু ও আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে হবে। পরিবার থেকেই শিশুদের ভালো-মন্দ, ন্যায় নীতি, দেশপ্রেম ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন বাড়ার কারণ ঃ

মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ঘাটতি, পারিবারিক শিক্ষার অভাব, পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা, ভোগবাদী মানসিকতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, নেতিবাচক মানসিকতা, সুস্থ বিনোদনের

ঘাটতি এবং মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অতিমাত্রায় ব্যবহার ও অপব্যবহারের কারণে বর্তমানে নারী ও শিশুর প্রতি অন্যায় ও সহিংসতা বাড়ছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় ঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সম্মিলিতিভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে -

১। মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
২। প্রত্যেককে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা।
৩। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়করণ ও পরিবার থেকে শিষ্টাচার ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা।
৪। ভোগবাদী মানসিকতা দূর করে তরুণদের উদার মানসিকতা সম্পন্ন প্রকৃত ও শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করা।
৫। পরিবার, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসাসহ সর্বক্ষেত্রে নারীদের সম্মানের চোখে দেখতে শেখানো।
৬। নারীদের দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা।
৭। নারী ও শিশুর প্রতি অপরাধের ক্ষতিকর দিক, পরিণতি ও শাস্তি সম্পর্কে সকলকে অবগত করা।
৮। শিশু ও কিশোরদের অতিমাত্রায় মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার ও অপব্যবহার রোধ করা।
৯। অপরিণত বয়সের তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসার করুণ পরিণতি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের সচেতন করা এবং তাদের এই মোহ ও ফাঁদে পা দেওয়া থেকে নিবৃত করা।

উপসংহার ঃ

সৃষ্টিকর্তার সেরা সৃষ্টি মানুষ। সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রত্যেককে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনা দিয়েছেন। আমাদের অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে ভাবতে হবে যে- প্রত্যেকটি মেয়েই কোন মা-বাবার পরম আদরের সন্তান, কোন ভাইয়ের বোন, ভবিষ্যতের কোন স্বামীর স্ত্রী এবং কোন স্নেহ ও মায়া মমতা জড়ানো সন্তানের মা। এই উপলব্ধি থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ ভোগবাদী ও নেতিবাচক চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা পরিহার করে শিশু থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধসহ সকল নারীদের সম্মানের চোখে দেখা ও তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। সামগ্রিকভাবে সমাজ ও দেশের সুষম উন্নয়নে পরিবার, সমাজ, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট, কর্মক্ষেত্রসহ দেশের প্রতিটি জায়গায় নারীদের নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশে বেড়ে উঠা, চলাফেরা ও আর্থিক কর্মকান্ড করার অবারিত সুযোগ তৈরী করতে হবে। তাই সর্বস্থানে ও সর্বক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ ও নিরাপদ শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সকল অভিভাবক, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, সমাজসেবক, ব্যবসায়ী, গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গসহ সকলকে দায়িত্বশীল, আন্তরিক ও সহমর্মিতাপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের প্রত্যেককেই আন্তরিকতার সাথে এই মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে।

নিম্নোক্ত উপায়ে প্রোগ্রামটি সহজে এবং স্বল্প সময়ে বাস্তবায়িত হয়ঃ

১। উপর্যুক্ত প্রোগ্রাম সুষ্ঠু ও সূচারুরূপে পরিপালন করার জন্য প্রোগ্রাম প্রাপ্তির পর থেকেই থানার নিয়মিত রোলকলে একাধিক দিন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কাউন্টার ন্যারেটিভ ও সকল সংযুক্তিসহ অত্র পত্র সকল অফিসার ও ফোর্সদের পরিপূর্ণরুপে ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

২। বর্ণিত স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বাজার-এ নির্ধারিত প্রোগ্রামের কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ করা হয়েছিল।

৩। নির্ধারিত প্রোগ্রামের কমপক্ষে ০৩ (তিন) দিন পূর্বেই ব্যানার ও লিফলেট তৈরী, নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণ ও সংশ্লিষ্ট সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বাজার/ধর্মীয় উপাসনালয়ে অত্র পত্র প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়।

৪। অত্র প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী বর্ণিত দলসমূহের দলনেতা ও অন্যান্য সদস্যরা(অফিসার) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কাউন্টার ন্যারেটিভটি সম্পর্কে প্রস্তুতি গ্রহণ করে নির্ধারিত স্থানসমূহে প্রাঞ্জল, যুক্তিপূর্ণ, শালীন ও সকলের জন্য গ্রহণযোগ্যভাবে বক্তব্য প্রদান করেন।

৫। প্রোগ্রামটি একই দিনে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন স্থানে কার্যকর করার নির্দেশনা থাকায়এক স্থানে প্রোগ্রাম চলা অবস্থায় প্রত্যেক দলের ০১/০২ জন সদস্য পরবর্তী ভেন্যুতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ভেন্যু প্রস্তুত রাখেন।

৬। প্রত্যেক ভেন্যুতে মতবিনিময় সভার এক পর্যায়ে উপস্থিত জনতা/ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে তাদের এলাকার/ বিদ্যালয়ের/ হাটবাজারের/ রাস্তাঘাটে যাতায়াতের পথে কোন নারী ও শিশু নির্যাতন (ইভটিজিং, শ্লীলতাহানি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন)/ অন্যান্য অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগ/সমস্যা মনোযোগ সহকারেশ্রবণ করে নোট নেওয়া হয়। পরবর্তীতে উক্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। প্রত্যেক বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষকে অত্র প্রোগ্রামের সাথে সংযুক্ত জনসচেতনতামূলক কাউন্টার ন্যারেটিভটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতঃ প্রতি মাসে অন্ততঃ ০১ (এক) বার সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা/ক-র্মচারীদের এসেম্বলিতে/সুবিধাজনক সময়ে বর্ণিত কাউন্টার ন্যারেটিভের আলোকে ব্রিফিং প্রদান /আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৮। প্রত্যেক বিদ্যালয় ও কলেজেরপ্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিতব্য প্রোগ্রামে সকল ছাত্র-ছাত্রীসহ তাদের অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নিকটস্থ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের (ইমাম/পুরোহিত) উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং সে অনুযায়ী তারা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৯। প্রত্যেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের (ইমাম/পুরোহিত) অত্র প্রোগ্রামের সাথে সংযুক্ত জনসচেতনতামূলক কাউন্টার ন্যারেটিভটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতঃ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে/ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (মসজিদ/মন্দিরে) সুবিধাজনক সময়ে মাসে অন্তঃত ০১ (এক) দিন ধর্মীয় অনুসারিদের মাঝে বর্ণিত কাউন্টার ন্যারেটিভের আলোকে ব্রিফিং প্রদান /আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

১০। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রোগ্রামে উল্লিখিত প্রত্যেক বিদ্যালয় ও কলেজের কমপক্ষে ০১ জন করে শিক্ষক ও ম্যানিজিং কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। এতে তারা পরবর্তীতে তাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে পারে। থানার সকল জনপ্রতিনিধি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের (ইমাম/-পুরোহিত/ সভাপতি/ সেক্রেটারি) সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতঃ বর্ণিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

বর্ণিত প্রোগ্রামটি মাহিগঞ্জ ও হারাগাছ থানা এলাকায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রোগ্রামটি অত্র থানা দুটির সর্বসাধারণ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে এবং এটি সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।জনসাধারণের মাঝে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যাপক আলোড়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।ফলে উক্ত থানা দুটিতে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ ও মামলা উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে প্রোগ্রামটি চলমান থাকবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম.....

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম.....

এগিয়ে চলেছে “ডিজিটাল বাংলাদেশ”

এ, কে, এম ওহিদুন্নবী •

বাংলাদেশকে আগামী দিনের ডিজিটাল পৃথিবীর নেতৃত্বের উপযোগী করে গড়ে তুলতে জনবান্ধব প্রশাসন অপরিহার্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশাসনকে সরকার মানুষের কাছে নিতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে চিহ্নিত ২৭৬০ টি ডিজিটাল সেবার মধ্যে ৯০০ টি সরকারী সেবা জনগণকে সরাসরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনগণকে ডিজিটাল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই।

জনগণকে বিনা ভোগান্তিতে এবং সহজে সরকারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞাবান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাসহ যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। জনগণকে যেসব সরকারি বিভাগ থেকে ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হবে সে সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও ডিজিটাল জ্ঞান থাকা জরুরী। এই ক্ষেত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে কিন্তু ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা জরুরী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দক্ষ নেতৃত্বে দেশে বিভিন্ন ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। জনপ্রশাসনের শতভাগ ডিজিটাল সেবাই পারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে।

আধুনিক প্রযুক্তির সব থেকে দৃশ্যমান উন্নয়ন এসেছে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায়। মোবাইল ফোনে এন্ড্রোয়েড প্রযুক্তির আবিস্কার এবং থ্রি-জি, ফোর-জি টেকনোলজির ব্যবহার মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করেছে। বাংলাদেশ অতি সম্প্রতি ফাইভ-জি টেকনোলজি উদ্বোধন করতে যাচ্ছে। সামনের দিনের প্রযুক্তি নতুন সভ্যতার সুযোগ করে দেবে। প্রযুক্তি আসবে-বদলাবে-রূপান্তরিত হবে। আমাদের দায়িত্ব ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তাদের উপযোগী দেশ গড়া।

ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে এনবিআর এগিয়ে গিয়েছে আরেক ধাপ, কাস্টমসের বড় তিনটি কার্যক্রম ওয়েব ভিত্তিক ও অনলাইন হয়েছে। এনইপি (ন্যাশনাল ইনকোয়ারি পয়েন্ট), কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স হটলাইন ও কাস্টম-ই-অকশন এর মাধ্যমে অনলাইনে এনবিআর এর ওয়েব সাইটে প্রশ্ন করে স্বল্পতম সময়ে উত্তর পাচ্ছেন করদাতা, অংশীজন। জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে প্রায় প্রতিটি সরকারি অফিসের জন্য হটলাইন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। তেমনি চোরাচালান রোধ করতে কাস্টমস্ গোয়েন্দার হটলাইনে ফোন দিয়ে বা ওয়েব সাইটে চোরাচালানের খবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শুধুমাত্র তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নেই নয়, ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন এবং রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। দেশি-বিদেশি অনেকগুলো কোম্পানী এখন বাংলাদেশী স্মার্ট ফোন ও ল্যাপটপ তৈরি করছে এবং বিদেশে রপ্তানীও করছে। অ্যামাজনের প্লাটফর্মের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা সাধারণের কাছে সরাসরি ওয়ালটনের ইলেক্ট্রনিক্স এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলো বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। যার ফলে সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও অপচয় রোধ করতে প্রি-পেইড বিদ্যুৎ বিল ব্যবস্থা চালু করেছে সরকার পাশাপাশি বিল পরিশোধের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল প্রদানের সুবিধা চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ

পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (পিডিবি) সাথে চুক্তি সই করেছে মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলো। এ চুক্তির ফলে গ্রাহকরা সহজ ও সুবিধাজনক উপায়ে প্রি-পেইড বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারছেন। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ছাড়াও গ্রাহকরা নিজের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ট্রেনের টিকিটও কিনতে পারছেন। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা এখন খুবই জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য একটি সেবা। বিকাশ, ইউক্যাশ, মোবাইল ওয়ালেট এসমস্ত সেবার মাধ্যমে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ করছে।

এদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছে বেসিস সদস্যভূক্ত ৩৫টি প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি সেসব প্রতিষ্ঠানে বেসিস সফট্ এক্সপোতে "বেসিস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিজিটাল এডুকেশন" চালু করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল করার লক্ষ্যে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রাণালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি সেবা দেয়ার কোন নির্দিষ্ট মানদন্ড বা নীতিমালা নেই। এছাড়া সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো তালিকাও নেই। ফলে, এ খাতে প্রতারণার আশংকা রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের সেবা দেয়ায় সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের উপর বিরূপ মনোভাব তৈরি হচ্ছে। তাই এডুকেশনাল ইন্সটিটিউট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের জন্য নির্দিষ্ট মানদন্ড নির্ধারণ ও সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভূক্তি করা জরুরী। এ বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উপলব্ধি করতে পারলে এ সফটওয়্যার খাতের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত সফটওয়্যার ব্যবহার নিশ্চিত হবে। এসডিজি'র লক্ষ্য-৪ (মানসম্পন্ন শিক্ষা) পূরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সরকারের একটি অনন্য উদ্যোগ।

আর এভাবেই দিনের পর দিন সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন, আর সেই সাথেই বিনির্মাণ হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা"।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ফোর্স)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

স্বল্প সময়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল ইউনিট সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করা

মোঃ ফরহাদ ইমরুল কায়েস •

রঙ্গে রসে ভরপুর আমাদের রংপুর। রংপুর জেলা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনতম জেলা। সু-প্রাচীনকাল থেকে এ জেলা গৌরবময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাসের ধারক ও বাহক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৮/০১/২০১১ খ্রিঃ রংপুর জেলা সফরকালে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১২/০৪/২০১৮ ইং তারিখে মহান জাতীয় সংসদে রংপুর মহানগরী আইন ২০১৮ পাশহয়। অতঃপর গত ১৬/০৯/২০১৮ খ্রিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

সূচনালগ্নে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের যাত্রাপথ মসৃণ ছিল না। অনেক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে এবং হচ্ছে। মাননীয় পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম ও উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনে অংশগ্রহণ করি।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের যাত্রাকালে এর অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত করার কাজে সক্রিয় সহায়তা করি। শুরুতে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ০৬ টি থানা চিহ্নিত করে জে, এল, নং- মৌজা ও মহল্লা ম্যাপ প্রস্তুত করা। আমরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজগুলো সম্পাদন করি।

একটি আধুনিক মহানগরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেতার কমিউনিকেশন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই ব্যবস্থা চালু করণে বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণে আমি সম্পৃক্ত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। পুলিশ লাইন্সের অন্য ইউনিটগুলো সচল করার লক্ষ্যে পুলিশ লাইন্স প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনায় এবং অস্ত্র, গোলাবারুদ, রায়ট সামগ্রী, অস্ত্র ভান্ডার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজে মেধা ও মনন দ্বারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করি।

এছাড়াও ডিজিটাল যুগের অন্যতম মাধ্যম আইসিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী, আবাসন ব্যবস্থাপনা, থানা/অফিস ভাড়ায় গ্রহণ ও সাজ সজ্জা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করি।

মেট্রোপলিটন পুলিশ এর কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে মেট্রোপলিটনের বিভিন্ন দপ্তর ও অফিসের ফরম / রেজিষ্ট্রার ইত্যাদি সরবরাহে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করি।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় একটি ভয়াবহ সমস্যা হলো কিশোর অপরাধ। প্রযুক্তি ও নগরায়নের দ্রুত উন্নতির ফলে কিশোর অপরাধ ক্রমাগত বাড়ছে। তাছাড়া মাদক সমস্যা বর্তমান সময়ে একটি আলোচিত ও জটিল সমস্যা। মাদকদ্রব্য তরুণ সমাজের এক বিরাট অংশকে অকর্মণ্য ও অচেতন করে তুলছে। অবক্ষয় ঘটাচ্ছে মুল্যবোধের। পুলিশ বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ ও নজরদারি এবং বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের ফলে মাদক সমস্যা অনেকখানি নির্মূল হয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ চালু হওয়ার পর মাননীয় পুলিশ কমিশনার, মহোদয়ের সঠিক ও কঠোর দিক-নির্দেশনায় চাঁদাবাজি, মাদক , কিশোর অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, অপহরণসহ নানা রকম অপরাধ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। নগরবাসী অহেতুক হয়রানী ছাড়া অনেক রকম সেবা গ্রহণ করছে। শহরের যানজট নিরসনে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অনেক বাস্তবমূখী ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অবৈধ মটরযান, অটোরিক্সা, ট্রাক, ট্যাংলরি, আটক ও এসবের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক ইউনিট নিরলস ও আন্তরিক-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি সকল ভুলত্রুটি সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকুলতা অতিক্রম করে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বাংলাদেশের অন্যতম আধুনিক মেট্রোপলিটন পুলিশ হিসেবে গড়ে উঠবে। আমরা সে লক্ষ্যেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। নগরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, ই-ট্রাফিকিং সিষ্টেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম.....

আইজিপি মহোদয়ের প্রেস ব্রিফিং

নাশকতামূলক প্রচারণা সামগ্রী উদ্ধারপূর্বক প্রেস ব্রিফিং

আরপিএমপি কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

মোবাইল কোর্ট এর একটি মুহূর্ত

আরপিএমপি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম.....

সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে চেকপোস্টে তল্লাশি

চেকপোস্টের একটি মুহূর্ত

ডিবি কর্তৃক ইভটিজিং বিরোধী অভিযান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে ইভটিজিং বিরোধী অভিযান

ডায়েরি

মোঃ আব্দুর রশিদ •

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় ফাতেমার। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরে নিদ্রাহীন রাত কেটেছে তার অনেক। আবার আধো ঘুম-আধো জাগা রাতও অনেক গেছে। ফাতেমার কাছে স্বাধীনতা মানে নিদ্রাহীন রাত। মার্চ মাসে আব্দুল হাই সেই যে কোথায় উধাও হলো আর ফিরে এলো না। এরি মধ্যে ফাতেমার চোখে ছানি রোগ আর ব্লাড প্রেসার ধরেছে।

ফাতেমার বালিশের কাছেই দিয়াশলাইয়ের বসবাস। অতি কষ্টে ম্যাচটা খুঁজে পায় সে। কুপিবাতি জ্বালায়। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটানা ঝি ঝি পোকার ডাক। ফাতেমার বুকের ভেতরটা ধুক্ করে ওঠে। এই বুঝি পাকবাহিনী এলো। পাঁচ সন্তানের মধ্যে আবদুল হাই চতুর্থ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পড়তো সে। মার্চের শেষে ও চলে যায় মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং-এ ভারতের দিনহাটায়। তারপর কতগুলো অপারেশন করেছে সে ও তার সঙ্গীরা তার ফিরিস্তি অবশ্য এখনও ফাতেমার সিথানে শোভা পায়।

ডিসেম্বরের পরেই যুদ্ধের সময়কার আবদুল হাইয়ের ব্যবহৃত ব্যক্তিগত ডায়েরি পাঠিয়ে দেয় মিত্রবাহিনী। আবদুল হাইয়ের লেখা ডায়েরিটা ফাতেমা প্রায়ই বুকে নেয়। খোকা ফিরে এসেছে এমনটি ভাবালুতায় ফাতেমা বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। কীসব কথা লিখেছে আবদুল হাই। কখনও লিখেছে কোথায় বাঁশঝাড়ে মুক্তিযোদ্ধারা এ্যামবুস নিল। সম্মুখ যুদ্ধে পাকবাহিনীর কজন মারা গেল। আবার কখনও লিখেছে দেশটা স্বাধীন হলে আবদুল হাই মার জন্য একটা সুন্দর গোলাপী রংয়ের শাড়ি প্রেজেন্ট করবে। মা ঐ শাড়ির আঁচল দিয়ে আবদুল হাইর মুখ মুছে দেবে ইত্যাদি.....।

গ্রামের সবাই নিশ্চিত আবদুল হাই আর ফিরে আসবে না। দেশটা স্বাধীন হলো। বাংলার ঘাস ফিরে পেল তার সবুজ সজীবতা। কাঁশফুল পেল তার যৌবনের মদীরতা। কৃষ্ণচূড়া ফুলে ফুলে রাঙিয়ে তুললো মিয়াবাড়ির ওঠোন। কিন্তু আবদুল হাই ফিরে এলো না। ফাতেমা পেল এক অন্ধকার ঘন অন্ধকার শ্মশান। কুপিবাতির সলতেটা ইদানিং খুউব ময়লা হয়। কেরোসিন তেলের বাজারেও ভেজাল। স্পষ্ট আলো দেয় না। ফাতেমা সিথান থেকে ডায়েরিটা বের করে। কোলে নেয়। চুমু খায়। ডায়েরিটা সহ দু'হাত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তোলে। চোখের নোনা জলে সমুদ্দর হয়।

ডায়েরিটার প্রায় পাতায় আবদুল হাই 'মা' কথাটা শীর্ষে লিখেছে। পাতার শেষে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ওর অলংকার। ফাতেমার অহংকার কী তাহলে মৃত আবদুল হাইয়ের মৃত্যু কঠিন বিভীষিকাময় অগোছালো ব্যস্ত হাতের লেখা পুরনো ডায়েরি। ফাতেমা কুপিবাতিটা কয়েকবার ফুঁ দিয়ে নেভাতে সক্ষম হয়। মাথা অব্দি কাঁথাটা জড়ায় সে। আবদুল হাইয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনে। সন্তানহারা মায়ের ঘুম মধ্যরাতে ভাঙলে কষ্টের সীমা থাকে না। কখন ঘুমিয়ে পড়ে সে। সকালে সূর্যটা পূর্বদিকে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। সিথানে রাখা ডায়েরির লেখাগুলো মনি-মুক্তো-হীরার মতো চক্‌চক্ করে।

অফিসার ইনচার্জ
কোতয়ালী থানা
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

আমাদের অর্জন আমাদের গৌরব

মোঃ তাজমিলুর রহমান •

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারী রংপুর জেলা সফরকালে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ মহান জাতীয় সংসদে "রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন-২০১৮" পাশ হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৬ সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কোতয়ালী, তাজহাট, মাহিগঞ্জ, হারাগাছ, পরশুরাম ও হাজিরহাট এই ০৬ টি থানা নিয়ে গঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের শুভ উদ্বোধন করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর/২০১৯ হতেই সুযোগ্য পুলিশ কমিশনার, জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম মহোদয়ের নেতৃত্বে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়।

আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ নগরবাসীকে উন্নত সেবা প্রদান, মাদক ও জঙ্গীবাদ দমনে পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। রংপুর মেট্রোপলিটন ট্রাফিক পুলিশের কার্যক্রম আরও বেশি গতিশীল, স্বচ্ছ এবং মটরযান চালকদের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ যাত্রার মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে ১১/১০/২০১৮ তারিখ ই-ট্রাফিক সেবা চালু করা হয়। ই-ট্রাফিক ব্যাবস্থাপনায় POS(Point of service) এর মাধ্যমে জনগণকে হয়রানির হাত হতে বাঁচিয়ে তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানের জন্য মোটরযান আইনে মামলা রুজু এবং সাথে সাথে জরিমানা আদায় করে জব্দকৃত কাগজপত্র ফেরত দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে চালু করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারনেট ভিত্তিক ট্রাফিক সেবা।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের প্রচেষ্টায় রংপুর মহানগরীর আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ইং ১৪/১১/১৮ খ্রিঃ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার সাথে রংপুর মহানগর পুলিশের সংযোগ সাধিত হয়। সিসি ক্যামেরার সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও মেট্রোপলিটন পুলিশ যৌথ ভাবে বিভিন্ন অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সহ সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন, ও যানজটমুক্ত মহানগর প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ যাত্রার শুরু থেকেই যানজট সমস্যার সমাধানের জন্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণী গোষ্ঠীকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা সহ শহরে ইজিবাইকের প্রবেশ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে যানজট পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য ও দৃশ্যমান উন্নয়ন করা হয়েছে। যানজট পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হওয়ায় জনমনে প্রশান্তি বিরাজ করছে।

গত ১০/১০/২০১৮ খ্রিঃ সুধা রানী (২২) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন এবং ভোর অনুমান ০৬.০০ ঘটিকার সময় অজ্ঞাতনামা আসামী কর্তৃক নবজাতক শিশুটি চুরি হয়ে যায়। দ্রুততম সময়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সদস্যরা চুরি যাওয়া নবজাতককে উদ্ধার করেন এবং নবজাতক চুরির সাথে জড়িত ইয়াসমিন সুলতানা মুন্নি (৩২) কে গ্রেফতার করেন। দ্রুততম সময়ে চুরি যাওয়া নবজাতক শিশু উদ্ধার হওয়ায় স্থানীয় জনগণের মধ্যে পুলিশ বাহিনীর ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হয়।

গত ১৫/১০/২০১৮ খ্রিঃ হতে ১৯/১০/২০১৮ পর্যন্ত রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় মোট ১৬৫ টি পূজামন্ডপে হিন্দু

সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গাপূজা/১৮ পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় অত্যন্ত আনন্দঘন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত হয়। গত ১৬/১০/২০১৮ খ্রিঃ রংপুর জিলা স্কুল মাঠে "শেকড়ের সন্ধানে" মেগা কনসার্ট পুলিশের দৃশ্যমান উপস্থিতিও তৎপরতায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানাধীন দমদমা ব্রীজ সংলগ্ন ঘাঘট নদীর পাড়ে প্রায় ০৩ (তিন) লক্ষ্যাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের অংশগ্রহনে গত ০১/০১/১৮ খ্রিঃ হতে ০৩/০১/১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপি রংপুর জেলা ইজেতেমা/২০১৮ শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র ইউনিটের যাত্রার শুরু থেকেই রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পুলিশের সাথে পাবলিকের দূরত্ব নিরসনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল অফিসার ও ফোর্সদের সকল সময়ে সর্বস্তরের জনগণের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ভালো ব্যবহার নিশ্চিত করে পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নত করার লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

নবসৃষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এলাকায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টেকসই ও গণমুখী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে জোরদার ও ফলপ্রসূ করার জন্য ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট মেট্রোপলিটন "কমিউনিটি পুলিশিং" গঠন করা হয়েছে। সাথে সাথে প্রতিটি থানা কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

গত ১৭/১১/১৮ খ্রিঃ তাজহাট থানাধীন শাহীন ট্রেডার্স এবং রাস্তার অপর পার্শ্বে মহানগর অটো দোকান ঘরে ভোর আনুমানিক ০৪.১০ হতে ০৪.৩৮ ঘটিকার মধ্যে অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জন ব্যক্তি দোকান ঘরের তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে ব্যাটারী এবং নগদ টাকা ট্রাকে করে নিয়ে যায়। উল্লেখিত ঘটনায় পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তাজহাট থানার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঢাকা, খুলনা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে স্বল্প সময়ের মধ্যে চোরাই কাজে ব্যবহৃত ট্রাক আটক এবং লুণ্ঠিত মালামালসহ ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন।

গত ১৫/১২/২০১৮ খ্রিঃ রংপুর মহানগরের মুন্সিপাড়াস্থ জনৈক মোঃ মফিদুল ইসলাম @ সালুর বাড়ীর কাজের মেয়ে সীমা কে হত্যা করে হত্যাকান্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টার মাধ্যমে ভিকটিমের লাশ গোপন রেখে ১৭/১২/২০১৮ খ্রিঃ রাত অনুমান ২৩.৩০ ঘটিকায় হারাগাছ থানাধীন কাচুটারী গ্রামে কবরস্থ করা হয়। গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পেরে চৌকস অনুসন্ধানী দল মৃত সীমার মায়ের নিকট ঘটনার সত্যতা যাচাই পূর্বক কোতয়ালী থানায় মামলা রুজু করেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা এজাহারনামীয় ০৫ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। আসামীরা বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ১৬৪ ধারার হত্যার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে কবরস্থান হতে মৃত সীমার লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর হওয়ায় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

২৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্বোধনের মাত্র তিন মাসের মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রস্তুতি হিসেবে কন্ট্রোল রুম স্থাপন, নিয়মিত তল্লাশী ও চেকপোষ্ট স্থাপন, তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রসী, জেএমবি/জঙ্গী ও ২০১৪ সালের নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধীদের গ্রেফতার অব্যাহত রাখা হয়েছিল যা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সহায়ক ছিল। পাশাপাশি নির্বাচনে জেলা প্রশাসন, বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, রংপুর রেঞ্জ, র‍্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী, আনসার-ভিডিপি ও নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে দারুন সমন্বয় ছিল। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার ফলে সংখ্যালঘু ও বিশেষ শ্রেণীর ভোটাররা উৎসাহিত হয়ে ভোট দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর সংসদীয় আসন-৩ সহ রংপুর-১ (আংশিক) ও রংপুর-৪ (আংশিক) এর নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। তিনটি সংসদীয় আসনের মোট ভোট কেন্দ্র ছিল ১৯৮ টি (৮৫ টি গুরুত্বপূর্ণ ও ১১৩ টি সাধারন) যার মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪,৯৪,৭৯১। তিনটি সংসদীয় আসনের ২০ জন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি আসনে গড়ে ৬০% ভোটারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, রংপুর মেট্রোপলিটনে কোনো নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি এবং নির্বাচন

পরবর্তী শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। সর্বোপরি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রংপুরবাসীর আস্থা অর্জনের মাধ্যমে নবসৃষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ তথা বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি সংক্রান্তে পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের জিরো টলারেন্স নীতি মোতাবেক রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অপারেশনাল পরিকল্পনা প্রণয়ণপূর্বক নিয়মিত অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে আসামী গ্রেফতার এবং মাদক দ্রব্য উদ্ধার অব্যাহত রেখেছে। এর পাশাপাশি এই ধরণের কর্মকান্ড যাতে রংপুর মহানগর এলাকায় বিস্তার করতে না পারে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত আছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কঠোর অভিযানের কারনে মাদকের ব্যাবহার অনেক কমে যাওয়ায় পুলিশের উপর স্থানীয় লোকজনের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর অহংকার, সদালাপী, চৌকস, নীতিতে হিমালয়ের মতো অটল, মেধাবী এবং সততায় শতভাগ পরিপূর্ণ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম মহোদয়ের নিকট রংপুর নগরবাসী সহজেই দেখা করতে পারেন, তাদের দাবী দাওয়া শোনেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতি মাসে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত কল্যাণ সভায় উপস্থিত সকল পদের পুলিশ সদস্যদের নিকট বিভিন্ন দাবী দাওয়ার কথা শোনেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাধান করেন। কল্যাণ সভায় ফোর্সের মনোবল বৃদ্ধি ও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রতিনিয়ত প্রদান করে থাকেন। প্রতি মাসে মাসিক অপরাধ সভায় ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুলিশ সদস্যদের মাঝে ক্রেস্ট ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন। পুলিশ কমিশনার মহোদয় গত রমজানে বিভিন্ন স্থানে ডিউটিরত পুলিশ সদস্যদের সাথে রাস্তায় ইফতার করেন। আমাদের প্রিয় পুলিশ কমিশনার মহোদয় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে তার পেশাদার, নিষ্ঠাবান, সৎ ও মানবিক কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ পুলিশ সপ্তাহ /২০১৯ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ পদক "বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল" বিপিএম (সেবা) প্রাপ্ত হন। এটি আমাদের রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অর্জন এবং আমরা প্রথম কমিশনার হিসেবে জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম মহোদয়ের মতো সৎ ব্যক্তিত্ববান, নীতিবান, ন্যায়পরায়ন, জনদরদী, ব্যক্তিকে আমাদের ইউনিটে প্রধান হিসেবে পেয়ে আমরা গর্বিত।

পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন)
তাজহাট থানা
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

একজন আলোর ফেরিওয়ালা

মোঃ আব্দুল কাদের দিদার •

ভালো কিছুর সাথে জড়িয়ে যাই। ভালো কিছু করি ইচ্ছে ছিল মনে মনে। কিন্তু পথ কিংবা উপায় ছিল না। নিজস্ব উদ্যোগে ছোট ছোট কিছু ভালো কাজ করেছিলাম। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আত্মপরিতৃপ্তি পাবার সুখ বড়ই আনন্দের। মন চাইছিল সেই সুখের পথেই হাঁটি। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবদুল আলীম মাহমুদ স্যার সেই সুযোগটি আমাকে করে দিয়েছে। এখন মনে হয় একজন ভালো মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া আর্শিবাদ। একজন পুলিশ কমিশনারের অনেক ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা তাকে অহংকার করতে বাধ্য করতে পারে। যখনি অহংকার বাসা বাঁধবে মনে তখনি নেতিবাচক বৈশিষ্টগুলো প্রকাশ পাওয়া শুরু করবে। সেক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার আবদুল আলীম মাহমুদ স্যার একজন অনন্য মানুষ। তিনি সকল মানবিক অসৎ গুনের বিপরীতে চলেন। এটিই তাঁর ষ্টাইল। রংপুর নগরীতে অনেক হোটেল। সারাদিন ব্যবসা করে বাড়তি খাবার গুলো ফেলে দেয়। পুলিশ কমিশনার আবদুল আলীম মাহমুদ স্যার বিষয়টি গভীর ভাবে ভেবেছেন। পরে হোটেল মালিকদের সাথে কথা বললে তারা রাতের বাড়তি খাবারগুলো নয় বরং স্যারের পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানিয়ে রান্না করা খাবার প্যাকেট করে দুঃস্থ, অসহায় ও বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। এ কাজের জন্য মানবতার বন্ধনে রংপুর নামের একটি সামাজিক সংগঠন দাঁড় করালেন। আমি সেই সংগঠনের একজন নিবেদিত কর্মী। দুঃস্থ শিশুদের হাতে খাবার তুলে দেয়া কতো যে আনন্দের তা লিখে বোঝানো যাবে না।

অবসর পেলেই আমি স্যারের সান্নিধ্যে যাবার চেষ্টা করি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর প্রতিটি কথা শুনি। মনে মনে লিখে রাখি। বাস্তবতার আলোয় মিলিয়ে জীবন সাজানোর চেষ্টা করি। স্যারের কাছ থেকে জেনেছি, কোন কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু করা ঠিক না। কারণ পরে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে হতাশায় ছেঁয়ে যায় জীবন। তিনি বলেছিলেন, মানুষ জন্মগতভাবে কখনই খারাপ থাকে না। পরিবেশগত কারণে বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে খারাপের পথে অগ্রসর হয়। তবুও সব মানুষের ভেতরেই একটি পবিত্র সত্ত্বা থাকে। পৃথিবীতে অনেক খারাপ কাজের মাঝে নিজেকে ভালো রাখা অনেক কঠিন একটি কাজ। নিজেকে ভালো রাখতে এবং ভালো একজন মানুষ হতে হলে নিজেকে নিয়ন্ত্রনের দায়িত্বটি পালন করতে হয় সবার আগে। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা যখন এমন কথা বলেন, তখন বোধিসত্ত্বা, বোধ থেকে বেরিয়ে নতুন একটি জগৎ তৈরী করে দেয়। একটি ভালোময় জগৎ। আমি এখন সচেতন ভাবে সেই জগতের বাসিন্দা।

মধ্যখানে স্যার পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য ছুটিতে গিয়েছিলেন। পলে পলে টের পেয়েছিলাম স্যারের অভাব বোধ। মাত্র এক বছরে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন তিনি। সব থানাকে অনলাইন সিষ্টেমের মধ্যে এনেছেন। ই-ট্রাফিকিং চালু করেছেন। নগরীর যানজট নিয়ন্ত্রনে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অপরাধ নিয়ন্ত্রনে দক্ষতার সাথে অনঢ় থেকে একের পর এক নির্দেশনা দিচ্ছেন। প্রতিটি থানা এরিয়ায় মাসিক ও সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, সবুজায়নে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ এবং বিশেষ করে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম জোড়দার করার জন্য প্রতিটি থানা কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে দিয়ে একটি চম্বুক গতি এনে দিয়েছেন।

আমি তো জানি, শিক্ষা হলো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের অব্যাহত অনুশীলন। এই চলমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিত হওয়ার চেয়েও ভালো মানুষ হওয়া যে খুব বেশি প্রয়োজন। কেননা, 'দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য

অথবা প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, মন না থাকলে মানুষ হয় না।' দিন দিন যে হারে শিক্ষিত সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সুশিক্ষিত সেই হারে বাড়ছে না। সুশিক্ষিত বা ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যে মানবীয় গুনাবলী, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এর সমন্বয় প্রয়োজন, সেই প্রক্রিয়া কতটুকু আছে ? দেশের দুর্নীতিবাজ বা বড় অপরাধীদের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সংখ্যাটিতে অশিক্ষিত বা মূর্খ মানুষের চেয়ে শিক্ষিতরাই বেশি।

সকল অসৎ গুনের উর্ধ্বে উঠা রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবদুল আলীম মাহমুদ স্যার একজন ভালোর আলোর ফেরিওয়ালা। তিনি একদিন বলেছিলেন, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আমরা সবাই ভালো কিছু চাই। চাই আমাদের সাথে ভালো কিছু ঘটুক। চাই সুখী হতে, মন ভাল রাখতে, সাফল্য লাভ করতে। আমরা সবাই দেশের ভাল চাই, চাই দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাক। এই "ভালো" শব্দটা আমাদের জীবনের সাথে, আমাদের বেঁচে থাকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শ্রদ্ধেয় স্যার, সকল ভালোর সুফলে আপনার জীবন পরিপূর্ন হয়ে উঠুক।

সাধারণ সম্পাদক
মানবতার বন্ধনে রংপুর

আরপিএমপি'র সেবামূলক কার্যক্রম.....

রক্তদান কর্মসূচি

মাহিগঞ্জ থানা চত্বরে বৃক্ষ রোপণ

জনসাধারণের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

কৃষককে ধান কাটায় সহযোগিতা

আরপিএমপি'র সেবামূলক কার্যক্রম.....

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

রাস্তায় ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গাছ অপসারণ

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

হত দরিদ্রদের সুপেয় পানির জন্য টিউবওয়েল প্রদান

আমরা নারী বাদক দল

পুলিশের চাকরি পাওয়াটা আমাদের সকলের জন্য অনেক স্বপ্নের মত ছিল। অবশেষে চাকরিটা যখন পেলাম পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই খুব খুশি। আমরাও খুব খুশি ছিলাম। তারপর সবই যখন বলা শুরু করল পুলিশের ট্রেনিংএ অনেক কষ্ট অনেক পরিশ্রম। তখন আবার একটু ভীতু হয়ে গেলাম। পূর্বে চাকরি পেয়েছে অথবা পুলিশে চাকরিরত আছে এমন অনেকের সাথে কথা বললাম অনেকেই সান্তনা দিল বললো যে, প্রথম প্রথম ট্রেনিংটা একটু কঠিন লাগে পরে ঠিক হয়ে যায়। যখন প্রথম দিন রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের গেটে নামলাম বুকটা ধুপধাপ করছিল। মনে হচ্ছিল পেছন থেকে দৌড়ে বাড়ি চলে যাই। পরে যখন গেইটটা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম প্যারেড গ্রাইন্ড আর সুন্দর গোছালো পরিবেশ দেখে মনে কেমন একটা সাহস কাজ করল। ঐ সময় প্রথম মনে হল, নিজেকে পুলিশ হিসেবে দেখতে যাচ্ছি। তারপর শুরু হলো আমাদের বেসিক ট্রেনিং। বেসিক ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতাগুলো আসলে যে বা যারা ট্রেনিং করেনি তাদেরকে বুঝিয়ে বলা মুশকিল। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হতো। সব কাজ সময় মতো করতে হতো। সবচেয়ে বেশী যেটাতে গুরুত্ব দেয়া হতো সেটা হল নিয়মানুবর্তিতা। এভাবে ট্রেনিং সিডিউল এর সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচেছ আমাদের পুলিশ হয়ে ওঠার দিনগুলো। ৬ মাস বেসিক ট্রেনিং শেষে আমরা ৪০ জন নারী কনস্টেবল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে যোগদান করলাম। তৎক্ষনাত আমাদের জানিয়ে দেয়া হলো আমাদেরকে আবার ৬ মাসের বাদক দলের ট্রেনিং এর জন্য যেতে হবে। একথা শুনে আমাদের সবার খুব মন খারাপ হয়েছিল। অনেকে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন বাহানা করছিল এমনকি অনেকে মেডিকেলেও ভর্তি হয়েছিল। যাই হোক পরিশেষে আমাদের সবাইকে যেতেই হয়েছে। প্রথম কয়েকদিন থাকা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়। কারণ প্রথমে ৫ তলা ব্যারাক এ উঠানো হয় তারপর ২ তলায় নামানো হয়। প্রথম যেদিন মিউজিক শেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সেইদিনটির কথা আমরা কোনো দিন ভুলবো না। প্রথম দিন বিউগলার-রা আমাদের অবস্থা দেখে আমাদেরকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা করেছে। অনেক লজ্জা পেয়েছি কারণ আমাদের দিয়ে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা শেখানো হয়েছে। এগুলো কী? এসব বলতাম আর হাসতাম। ট্রেনিংটা অনেক সময় কষ্টের মনে হত কারণ পুরো রোদে আমাদের ট্রেনিং করাতো

আমরা যারা বিগ ড্রাম বাজাতাম তারা কয়েকটি গাছ মেরে ফেলেছিলাম। গাছে পিটিয়ে শিখতে হয়েছে। হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। হাতগুলো ছেলেদের মতো হয়ে গেছে। ২ মাসের মাথায় হঠাৎ রাত ২:৩০ মিনিটে ব্যারাকে আগুন লেগে যায় আমরা অনেক ছুটাছুটি করি। সেই রাতের পরে আরো একটি রাত ছিল সেই রাতে নাকি একজন ব্যাচমেট শিশু ছেলে বাচ্চাকে কাঁদতে দেখেছে। সেই রাতেও কারো ঘুম হয়নি। আর মাঠে সর্বোচ্চ কষ্টের কাজ ছিল ফেটিগ। সুযোগ পেলেই ফেটিগ করাতো। আর আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিন খাবার নাস্তার রুটির সাথে যুদ্ধ করে খেতে হতো। এভাবে ৪ মাসের মাথায় পবিত্র ঈদুল ফিতর এর ছুটি যাই। এসে আমরা আমাদের যন্ত্রপাতি পাই। যখন এই বিগ ড্রাম গলায় ঝুলাতাম খুবই হাসত সবাই। বাঁশি যারা বাজাতো তাদের মুখ বাকা বলে ক্ষেপাতো। তারা সবাই অনেক রেগে যেত। তিন ঘন্টার বাদক ক্লাস হতো। বিশ্রামের সময় দিলে সবাই দৌড়ে ছুটে আসত ছায়ায়। সবচেয়ে হাসির বিষয় ছিল সবারই কিছুনা কিছু নাম পরিবর্তন হয়েছিল। যারা বিগ ড্রামার ছিল তাদের বিগড্রাম, যারা পাইপ বাজাতো তাদের নাগিন আর আরো কিছু মেয়ে ছিল যাদের কচ্ছপ বলে ডাকা হতো। পরে এই ড্রামের আর বাঁশির শব্দ ধীরে ধীরে আমাদের আপন হতে লাগল। অনেক রোদ হলেও ড্রাম বাজাতাম, ঝুনঝুনি বাজাতাম এবং বাশির তালে স্যারসহ সবাই নাচতাম গান গাইতাম। গেমস ড্রেসে রুমাল চোর খেলতাম।

আমাদের সিএইচএম স্যার অনেক ভদ্র ও অনেক ডিসিপ্লিন মানতেন। সব স্যারেরা অনেক ভালো ছিলেন অনেক আনন্দময় ছিল ট্রেনিং এর সময়গুলো। অনেক বোন ছিল অনেক ব্যাচমেট ছিলাম সব মিলিয়ে এতো কষ্টের মাঝেও ভালো ছিলাম। এখন বাদক দলের সদস্য হিসেবে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করি। আমরা নারী বাদক দলের প্রতিটি সদস্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার জনাব মোঃ আবদুল আলীম মাহমুদ স্যারকে। তার বিশ্বাস ছিল আমরা নারী কনস্টেবলরা বাদক দল তৈরি করতে পারবে। আমরা তার বিশ্বাস রক্ষা করতে পেরেছি। আমরা আরোও আনন্দিত হই এটা জেনে যে শুধুমাত্র রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে রয়েছে নারী বাদক দল। মনে হয় অনেক আনন্দ, হাসি, বেদনার পরেও আমাদের একটি প্রাপ্তি আছে আমরা নারী বাদক দল।

* নারী ব্যান্ডদলের সদস্য

বৃষ্টি

মাহিন মুনতাহা (রুপন্তী)

বইছে পবন গগন জুড়ে
বৃষ্টি ইলশে গুঁড়ি,
গগন মাঝে মেঘের ফাঁকে
আভার ছড়াছড়ি,
বাদলা দিনে বৃষ্টির সুবাস
চারিদিকে ছড়ায়
কান পেতে শুনি রিমঝিম ধ্বনি
বাদল ঝড়ছে ধরায়।
কদম কেয়ার মিষ্টি সুবাস
পবনে চুইয়ে পড়ে,
বদ্ধ ঘরে ধারাপাতা দেখে
ছেলেবেলা মনে পড়ে।
বাদলের ধারা সবুজ পাতায়
তোলে সুমিষ্ট সুর,
অনিলের তালে কাদম্বিনি
বয়েচলে বহুদুর।
বৃষ্টি তোলে নিঝুম বনে
রিমঝিম ধ্বনি,
ধুলোর ধরায় বৃষ্টি হেন
অসীম সুখের খনি।
ফুল, ফল, মাটি, লতা, পাতা
সকলি ভিজতে রাজি,
মধুর ধারায় মাতাল হয়ে
ভিজছে অবনী আজি।
গহিন বনে ভিজছে ধারায়
শুকনো পাতার স্তুপ,
বাদল ধারায় উঠছে ফুটে
সারা পৃথিবীর রুপ।
বৃষ্টি যেন সবার মনের
শান্তির উল্লাস,
তীব্র রোদে ক্লান্ত প্রকৃতির
স্নিগ্ধতার উচ্ছ্বাস।

- নবম শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ

"বাংলার জনক"

মোঃ রেজাউল করিম

বঙ্গবন্ধু জাতির মহান নেতা,
বাংলার তুমি জন্মদাতা।
তোমার প্রেরণায় ধরেছি অস্ত্র
বাঙালি মোরা করেছি যুদ্ধ,
ত্রিশ লক্ষ প্রাণের ঢেলেছি রক্ত,
ছিনিয়ে এনেছি স্বাধীনতা।

হাজারো বাঙালির স্বপ্ন পেয়েছে পূর্ণতা
তুমি বিশ্বের মহান নেতা-
নিয়েছো মান, পূর্ণ করেছো প্রাণ
উদ্ভাসিত করেছো নিপীড়িত জনতা;
দূর করেছো বাঙালির মর্মব্যথা।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তুমি!
তোমার ত্যাগের মহিমা নিয়ে তোমায় নমি।
"৭৫ এর ১৫ আগস্ট বিদায় নিলে!
তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলা ছেড়ে!
তোমার মাটি!
তোমার জাতি!
নিরলস তোমায় খুঁজে ফিরে।
অবাক পিতা! কভু আর ফিরে না এলে;
রয়ে গেলে নিষ্ঠুর স্মৃতি হয়ে।

- কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

প্রথম নারী সার্জেন্ট

মোঃ মাহবুর রহমান

তোমাকে দেখলাম সে দিন,
গ্রীস্মের প্রচন্ড দাবদাহে
রাস্তার মাঝখানে দাড়িয়ে
শরীরের নরম ত্বক পুড়িয়ে
নিরসন করছ যানজট।

তোমাকে দেখার পর,
মস্তিস্কে এক প্রশ্নের উদয়?
কাজটা তোমার ছিলনা,
তা ছিল পুরুষ সার্জেন্টদের।
কিন্তু
তুমি নারী এখানে কেন?
কেনইবা নিরসন করছ
রাস্তার যানজট।

এবার
নিজের উত্তর নিজেরই প্রশ্নে,
ভূলেই গিয়েছিলাম
বসবাস আমার ডিজিটাল দেশে।
বাংলাদেশ পুলিশে
শুধু পুরুষরাই সার্জেন্ট হবে
নারীরা কেন নয়,
কোন অংশে কম তারা
কেনইবা ছিনিয়ে নিতে পারবেনা
সু-নিশ্চিত বিজয়।

আগে দেখতাম
নারীদের কর্মপরিধি ছিল
চুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
আজ একি দেখছি
নারীরাও নেমেছে আটঘাট বেঁধে
সোনার দেশে সোনা ফলাতে
তারাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আগে জানতাম
পুলিশের অন্যতম কষ্টের কাজ
যানজট নিরসন,
আজ একি জানছি
সেই কষ্টের কাজের মধ্যেই
এক ঝাঁক তেজীনারীর আরোহন।

তুমি নও আজ অবহেলিত
নও কোন কাজে সংকীর্ণ,
সেবা দিয়ে করেছ আজ
বাঙালি জাতিকে পরিপূর্ণ।

তুমি কনষ্টেবল,
তুমি এসআই,
তুমিই সুপারিন্টেন্ডেন্ট।
তুমি রমণী, তুমি ঘরণী,
তুমিই বাংলাদেশ পুলিশে
প্রথম নারী সার্জেন্ট।

- সিটিএসবি, আরপিএমপি, রংপুর

সেবার জন্য পুলিশ

মোঃ গোলাম মোস্তফা

তুমি নেই কোনোখানে, আছো তুমি সবখানে
জলে, স্থলে, বাসে-ট্রেনে ট্রাফিক পোষ্টে কিংবা জনগণের মাঝখানে
সূর্যোদয়ে বা দুপুরের কাঠফাটা রৌদ্দুরে
রাতের গহীনে কিংবা সন্ধ্যার অবকাশে
শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে অশান্তি কিংবা দাঙ্গায়
জলদস্যু তাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ায় ডাঙ্গায়।
তোমার অসীম সাহস দেখে ভয়ে কাতর
মানুষরূপী হায়েনা আর চোর জোচ্চর
অপরাধীর আস্তানায় হানো আঘাত
দুমড়ে মুচড়ে ফেলো সন্ত্রাসী কিংবা মাদক ব্যবসায়ীর কালো হাত।
ভালোবাসায় সিক্ত করো শিশু কিংবা নিরপরাধীকে
শান্তির বার্তা পৌঁছে দাও জনপদে।
যে হাতে তোমার লাঠিয়ালের লাঠি
সে হাতে কখনো বা জাদুর কাঠি
করো জাদুর ছোঁয়ায় চোর ডাকাত কিংবা দুষ্টের দমন
ভালোবেসে করো শিষ্টের পালন
কখোনো বা অগ্নিমূর্তি দাঙ্গায় রণতূর্য
হাসো বিজয়ের হাসি ভেঙ্গে অপকর্ম।
হাতকড়া পরাও চোর ডাকাত কিংবা দুষ্টের হাতে
হাতে হাত রেখে চলো অন্ধ কিংবা অসহায়ের সাথে
নিজের জন্য নেই তোমার কোনো ভাবনা
দেশের জন্য করে যাও শুধু শুভ কামনা।

- কন্সটেবল, আরপিএমপি, রংপুর

গুজব প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচারণা.....

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম.....

কমিউনিটি পুলিশিং রংপুর মেট্রোপলিটন কমিটির কার্যক্রম....

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
শৃংখলা
আস্থা
প্রগতি